بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকৃত সাম্যবাদীরা আসুন, পথ পাওয়া গেছে

অনেকে বাম আদর্শে বিশ্বাসী বলতেই নাস্কি বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়। বাম আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে বিরাট একটি সংখ্যা আছেন যারা মূলত ধর্মীয় গোঁড়ামী ও অন্ধত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে সচেষ্ট। বর্তমানে পৃথিবীতে বিরাজিত সবগুলো ধর্মই যখন বিকৃত হয়ে ধর্মব্যবসায়ীদের পণ্যে পরিণত হয়েছে, সেগুলো সাম্প্রদায়িক উগ্রপন্থীদের দ্বারা এবং কথিত ডানপন্থীদের দ্বারা ভুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে মানুষের সমাজকে পশুর সমাজে পরিণত করছে, সেই বিকৃত ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই প্রতিটি বোধসম্পন্ন মানুষের অবশ্য কর্তব্য। এই বিকৃত aর্মবিশ্বাস আমাদের এই জাতিটিকে অন্য জাতির দাস বানিয়ে রেখেছে। এ চরম সত্যটি উপলব্ধি করেই মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাতে করে এই বিকৃত ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা দূষিত পরিবেশকে নির্মল, অনাবিল ধর্মের শাশ্বত শিক্ষার দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে পারেন।

ধর্ম এবং ধর্মীয় কুসংস্কার- এ দুটি পৃথক বিষয়। আজ বিকৃত ধর্মগুলো মানুষের অকল্যাণ করছে এজন্য স্রষ্টাকে যারা দায়ী করেন তারা ভুল করেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা সমাজ পরিবর্তনের আশায় ব্যক্তিজীবনে যে অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং দুঃসাহসী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন, এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, তারা সর্বযুগে পূজনীয় থাকবেন। কিন্তু বাস্বে সেটা হয় নি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ মানুষকে কার্যত শান্তি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক নেতারা বিশ্বজুড়ে যে 'যৌথখামার', 'ওয়ার্কার্স প্যারাডাইস' সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন সেটা গণমানুষের জন্য নরককুণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে সর্বস্ব ত্যাগকারী সেই বিপ্লবীদের ভাস্কর্যগুলোর উপর তাদের নিজ দেশের মানুষ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। সমাজতন্ত্রের চেতনা তাদের কাছে ফাঁকাবুলি বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই এককালের বহু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আজ ঘোর পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শান্তি মেলে নি। জ্বলন্ত কড়াই থেকে তারা লাফ দিয়ে চুলায় পড়েছে মাত্র। আর যারা মুখে শ্রেণিহীন সমাজের কথা বলেন আর নিজেরাই পুঁজিপতি পেটমোটা বুর্জোয়া হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন, আমাদের দৃষ্টিতে তারা বিশ্বাসঘাতক, তারা উদ্বাস্তু তাদের আদর্শের ভূমি থেকে। সর্বত্যাগী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা হেযবুত তওহীদ বলতে চাই, আমরাও মানবতার কল্যাণে নিজেদের mKj mnú`, Rxeb, cwievi, cÎ-পরিজন ত্যাগ করেছি। তবে আমাদের জীবন ধন্য যে, আমরা সঠিক পথ পেয়েছি যা পরীক্ষিত সত্য। তাই ঘুঁনে ধরা সমাজটিকে যারা পুনর্নির্মাণ করতে Pvb, mecKvi অবিচার, অত্যাচার ও শোষণের প্রতিবাদে যার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, মহাসত্যের আহ্বানে যাদের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার খেলে যায়, ডান-বাম নির্বিশেষে সেই মানবধর্মের অনুসারীদের প্রতি আমাদের আহ্বান- আসুন, পথ পাওয়া গেছে।

যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হলো

আদম (আ.) থেকে হযরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত আল্লাহ অসংখ্য নবী রসুল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাদের জাতির কাছে যে জিনিসটা নিয়ে এসেছেন তা হলো তওহীদ অর্থাৎ জাতীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের কোনো কথা আছে, আদেশ নিষেধ আছে সেখানে আর কারোটা না মানা। নবী রসুলদের মাধ্যমে আসা এই তওহীদের দাবি যখন যে জাতি মেনে নিয়েছে তখন তারা পুরস্কারস্বরূপ, ফলস্বরূপ শান্তি cY fvimvg¨h³ mgvR পেয়েছে। সে সমাজে কোনো অন্যায় অবিচার থাকত না, যুদ্ধ রক্তপাত থাকত না। সমাজে দেহ, আত্মার সুন্দর ভারসাম্য বিরাজ করত।

এই নবী রসুল পাঠানোর ধারাবাহিকতায় শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা.) এর আগমনের প্রায় ৫০০ বছর আগে আল্লাহ পাঠালেন ঈসাকে (আ.)। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল শুধুমাত্র মুসা (আ.) এর অনুসারী ইহুদি জাতির কাছে। তিনি এসেছিলেন মুসা (আ.) এর আনীত দীনকে সত্যায়ন করে শুধু মাত্র দীনের হারিয়ে যাওয়া আত্মিক ভাগটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে দীনেi fvimvg¨ পুনঃস্থাপনের জন্য। তিনি কখনই খ্রিষ্ট ধর্ম নামে নতুন কোনো ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি। তাঁর জীবনী থেকে এ কথার প্রমাণ দেওয়া যায়। ঈসা (আ.) যদি ইহুদিদের বাইরে তার দেখানো পথ অনুসরণ বা গ্রহণ করতে বলতেন তাহলে তা হতো চরম সীমালংঘন ও অনধিকার চর্চা। KviY móv Zvi কাজের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং তা অবশ্যই শুধুমাত্র ইহুদিদের ভেতরে। কোনো নবীর পক্ষেই এই সীমারেখা অতিক্রম করা সম্ভব নয়, এবং ইতিহাস সাক্ষী যে ঈসা (আ.) তা কখনই করেন নি। একজন অ-ইহুদির শুধুমাত্র রোগ সারিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলেও তিনি ইতস্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর সীমারেখার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, I was sent only to the lost sheep of Israel. (Matthew 15:24) অর্থাৎ আমি শুধু মাত্র বনি ইসরাইলের পথভ্রষ্ট মেষগুলোকে পথ দেখাতে এসেছি। তিনি যখন তাঁর প্রধান ১২ জন শিষ্যকে প্রচার কাজে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন তখন তাদের উপদেশ দিলেন, Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel." (Matthew 10:5-৬) অর্থাৎ "তোমরা অন্য জাতিগুলোর কাছে যেও না এবং সামারিয়ানদের নগরে প্রবেশ করো না। শুধুমাত্র ইসরাইলি পথভ্রষ্ট মেষগুলোর কাছে যেতে থাকবে।"

এভাবে ঈসা (আ.) যখন তাঁর প্রচার কাজ শুরু করলেন তখন সেই চিরাচরিত ব্যাপারের পুনরানুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেল অর্থাৎ পূর্ববর্তী দীনের, মুসা (আ.) এর আনিত দীনের ভারসাম্যহীন বিকৃত রূপের যারা ধারক বাহক ছিলেন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সেই পুরোনো কারণ, আত্মম্ভরিকতা! কী? আমরা সারাজীবন ধরে বাইবেল চর্চা করলাম, এর প্রতি শব্দ নিয়ে গবেষণা করে কত রকমের ফতোয়া আবিষ্কার করলাম, এসব করে আমরা রাব্বাই, সাদ্দুসাই হয়েছি। আর

এই সামান্য কাঠমিস্ত্রির ছেলে কি না আমাদের ধর্ম শেখাতে এসেছে! ঈসা (আ.) তাদেরকে বড় বড় মোজে'জাগুলো দেখানোর পরও তারা কেউই তাঁকে স্বীকার করল না। শুধুমাত্র সমাজের নিম্নশ্রেণীর হাতে গোনা কিছু ইহুদি তাঁর প্রতি ঈমান আনলো।

দীর্ঘ ৩ বছরের প্রচেষ্টায় মাত্র ৭২ জন মতান্তরে ১২০ জন ইহুদি তাঁর উপর ঈমান আনল ও তাঁর দেখানো পথে চলতে শুরু করল। কিন্তু বিকৃত দীনের ধারক বাহক রাব্বাই, সাদ্দুসাইরা তাদের তখনকার প্রভু রোমানদেরকে এই কথা বোঝাতে সক্ষম হলো যে, ভবিষ্যতে ঈসা (আ.) রোমানদের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হবে। ফলে এই পুরোহিতরা রোমানদের সাহায্য নিয়ে ঈসা (আ.) কে হত্যার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করল। তখন আল্লাহ তাকে সশরীরে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর যে শিষ্য তাঁকে রোমানদের হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল তার চেহারা অবিকল ঈসা (আ.) এর মত করে দিলেন। ফলে তারা তাকে ঈসা (আ.) মনে করে হত্যা করল। এই ঘটনার পর ঈসার (আ.) যে ৭২ জন অনুসারী ছিল তারা প্রাণভয়ে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে গেল। গোপনে ব্যক্তিগতভাবে ঈসা (আ.) এর পথে চলা ছাড়া তাদের আর কোনো Dcvq iBj bv|

কিছুদিন পর পল নামের একজন লোক ঈসা (আ.) এর উপর বিশ্বাস আনলো। তবে তার পরবর্তী কাজগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, ঈসা (আ.) এর অনুসারীদের মাঝে ঢুকে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে বারবার যে কাজে সাবধান করে দিয়েছিলন অর্থাৎ অ-ইহুদিদের মাঝে তাঁর শিক্ষা প্রচার করা যাবে না, কিন্তু পল তার অনুসারীদেরকে এই শিক্ষা ইহুদিদের বাইরে প্রচার করার জন্য প্রস্তাব দিলো। প্রথমত ঈসা (Av.) Gi wkl¨iv Zvi GB c¯তাবে ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ এটা সরাসরি তাদের শিক্ষকের শিক্ষার বিপরীত। কিন্তু পল তাদের মত বদলাতে সমর্থ হলেন সম্ভবত এই যুক্তিতে যে, বনি ইসরাইলিদের মধ্যে ঈসা (আ.) এর শিক্ষা প্রচার অসম্ভব, যেখানে ঈসা (আ.) নিজে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছেন সেখানে শিষ্যরা যে হতাশ হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তাই ঈসা (আ.) এর এই শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে তারা তাঁদের শিক্ষকের সাবধানবাণীকে প্রত্যাখ্যান করে এই শিক্ষাকে বাইরে প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন (Acts xiii, 46-৪৭)। পল কিন্তু ঈসা (আ.) এর কাছে থেকে সরাসরি তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি, তাই তাঁর শিক্ষার আসল মর্মবাণী সে পায় নি। কিন্তু যখন ঈসা (আ.) এর শিক্ষাকে বাইরে প্রচার করা শুরু হলো তখন পল হয়ে গেলেন ঐ ধর্মের অন্যতম একজন প্রবক্তা। কাজেই তিনি যে শিক্ষা প্রচার করেছিলেন তা যে শুধু ঈসা (আ.) এর ধর্মের থেকে বহু দূরে তাই নয়, প্রধান প্রধান ব্যাপারে একেবারে wecixZ|

এই প্রচারের ফলে অ-ইহুদিদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অংশ এই শিক্ষা গ্রহণ করে পলের উপদেশ মত তাদের জীবন পরিচালনা করতে লাগল। পল তার ইচ্ছামত এই শিক্ষাকে chvM বিয়োগ করে নতুন এক ধর্মের সৃষ্টি করল। যা মুসা (আ.) এর ধর্মও নয়, ঈসা (আ.) এর আনীত আত্মিক ভাগও নয়, পলের হাতে পড়ে সম্পূর্ণ নতুন এক ধর্মই সৃষ্টি হয়ে গেল যাকে খ্রিষ্ট ধর্ম না

বলে পলীয় ধর্ম বললেও ভুল হবে না। এই খ্রিষ্ট ধর্মরূপী, কার্যত পলীয় ধর্মটি ক্রমে ক্রমে সমস্ ইউরোপে গৃহীত হয়ে গেল। তবে আসল ব্যাপারটা ঘটল তখনই। যুগে যুগে মানুষ তদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করে এসেছে ধর্মের বিধান দিয়ে। ধর্মের বিকৃত পুরোহিতদের হস্ ক্ষেপের ফলে ঐ ধর্মের আসল রূপ বিকৃত হয়ে গেলেও কিন্তু ঐ বিকৃত রূপকেই ধর্মের বিধান বলেই চালাতে হয়েছে।

রাষ্ট্র সর্বদাই চলেছে ধর্মীয় বিধি বিধান, আইন কানুন দ্বারা। স্বভাবতই খ্রিষ্টধর্মকে যখন সমস্ ইউরোপ একযোগে গ্রহণ করে নিল তখন তারাও চেষ্টা করল খ্রিষ্টধর্মকে দিয়ে তাদের জাতীয় জীবন পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মে তো কোনো আইন কানুন, দণ্ডবিধি নেই এটা ইহুদি ধর্মের হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে পুনঃস্থাপনের এক প্রক্রিয়াgvÎ| RvZxq Rxeb cwiPvjbvi Rb¨ যা কিছু দরকার তা ইহুদিদের কাছে অবিকৃত ছিল। কিন্তু ইহুদি ধর্ম থেকে ঈসা (আ.) এর আনিত আত্মিক ভাগকে পৃথক করে ফেলায় খ্রিষ্টধর্ম সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। তবুও ঐ চেষ্টা করা হলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে, এ অচল, Am¤¢ব। প্রতিপদে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অঙ্গনে সংঘাত আরম্ভ হলো। এই সংঘাতের বিস্তৃত বিবরণে না গিয়ে শুধু এটুকু বললেই চলবে যে, এই সংঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ইউরোপীয় নেতা, রাজাদের সামনে দুইটি মাত্র পথ খোলা রইল। হয় এই জীবনব্যবস্থা বা ধর্মকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। আর নইলে তাকে নির্বাসন দিতে হবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে। তৃতীয় আর কোনো রাস্ রইল না। যেহেতু সমস্ ইউরোপের মানুষকে নাস্িK বানানো সম্ভব নয়, কাজেই তারা দ্বিতীয় পথটাকেই বেছে নিল। অষ্টম হেনরীর সময় ইংল্যাণ্ডে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মকে সার্বিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করা হয়। ইংল্যাণ্ডের পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ খ্রিষ্টান জগত এই নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে বাধ্য হলো। এরপর থেকে খ্রিষ্টান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন দণ্ডবিধি ইত্যাদি এক কথায় জাতীয় জীবনে স্রষ্টার আর কোনো কর্তৃত্ব রইল না। জন্ম হলো ধর্মনিরপেক্ষতার|

আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও মানবজাতির ইতিহাসে এই ঘটনাটি সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই প্রথম মানুষ তাদের জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে। ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসন দেওয়ার ফলে হয়তো এ আশা করা যেত যে জাতীয় জীবনে ন্যvq-অন্যায়ের মানদণ্ড না থাকায় সেখানে যত অন্যায়ই হোক ধর্মের প্রভাবে ব্যক্তি জীবনে মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ও মানবিক মূল্যবোধে পূর্ণ থাকবে। কিন্তু তাও হয় নি। কারণ মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার রইল ঐ ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ ধর্মহীন, ন্যায়-Ab¨vq বোধহীন জাতীয় ভাগটার হাতে। সুতরাং অনিবার্য ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত জীবন থেকেও ধর্মের প্রভাব আস্ে আস্ে লুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করল। স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধানে যে দেহ ও আত্মার ভারসাম্য ছিল তার অভাবে ঐ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে মানুষ সৃষ্টি হতে লাগল তাদের শুধু একটি দিকেরই পরিচয় লাভ হলো-দেহের দিক, জড়, স্থূল দিক, স্বার্থের দিক, ভোগের দিক। জীবcbi অন্য দিকটার সাথে তাদের পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সৃষ্টি করে তা

জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করার ফলে শুধু জাতীয় জীবনই অন্যায়-অত্যাচার, অশান্তি ও রক্তপাতে পূর্ণ হয়ে যায় নি, যেখানে ধর্মকে টিকে থাকার অধিকার দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে, সেখানেও অধিকাংশ মানুষের জীবন থেকে ধর্ম বিদায় নিয়েছে, নিতে বাধ্য হয়েছে। দেহ থেকে আত্মা পৃথক করার পরিণাম এই হয়েছে যে, মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে।

আমরা সমাজে প্রচলিত অন্যায় অপরাধের জন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দায়ী করে থাকি কিন্তু একটু গভীরে গেলেই আমরা দেখব যে, এই সকল অশান্তির জন্য এই ধর্মনিরপেক্ষ সিস্টেমই দায়ী। মানুষ প্রকৃতপক্ষে কাদামাটির ন্যায়। এই কাদামাটিকে যে ছাঁচ বা ডাইসের মধ্যেই ফেলা হবে, কাদামাটি সেই ডাইসের আকার ধারণ করবে। কখনও কোনো মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে চোর হয়ে, ডাকাত হয়ে, অন্যায়কারী, দূর্নীতিবাজ হয়ে জন্ম নেয় না। কিন্ত অন্যায় সমাজব্যবস্থার প্রভাবে তারা ধীরে ধীরে এমন অপরাধী চরিত্রের হয়ে যায়। অন্যান্য জাতির মত আমরাও এমনই এক স্রষ্টা বিবর্জিত আত্মাহীন সিস্টেম গ্রহণ করেছি, যার আবশ্যম্ভাবী ফল আমরা এড়াতে পারছি না। মানুষ হয়ে যাচ্ছে আত্মাহীন জানোয়ার। এই সিস্টেমে খুব সহজেই মানুষের সদগুণাবলিকে Amদগুণাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। শত চেষ্টা করেও মানুষ ভালো হয়ে থাকতে পারছে না। সুতরাং মানুষকে মনুষ্যত্ব ফিরে পেতে হলে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর দেওয়া ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করাই এখন একমাত্র সমাধান।

ইসলামের অর্থনীতির সফলতা এবং
c‡Rev` I gvKmীয় অর্থনীতির ব্যর্থতার নেপথ্যে

মানুষ মূলত সামাজিক জীব এবং সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তার কারণ কোনো মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, জীবনধারণের জন্য তাকে কোনো না কোনো কারণে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতেই হয়, নির্ভরশীলতার কারণেই তাকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে হয়। সমাজবদ্ধভাবে Rxebhvcb Kরতে গেলে মানুষকে স্বভাবতই একটি নিয়ম-কানুনের অর্থাৎ সিস্টেমের মধ্যেই বাস করতে হয়। যে সিস্টেমের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ামক থাকতে হয়। এই সিস্টেম বা নিয়ামককে জীবনব্যবস্থা বলা যায়। স্বভাবতই সেই জীবনব্যবস্থায় একদিকে যেমন থাকবে আত্মিক উন্নয়নের ব্যবস্থা অন্যদিকে আইন কানুন, `Êwewa, A_bxwZ, ivRbxwZ, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি সর্বপ্রকার ও সর্ববিষয়ে বিধানও থাকতে হবে। একটি জীবনব্যবস্থা ছাড়া সমাজবদ্ধ জীবের বাস করা বা জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব। মানুষের কাছে কাম্য হচ্ছে এমন একটি জীবনব্যবস্থার মধ্যে সে বাস করবে, যে জীবনব্যবস্থাটি হবে সঠিক ও নির্ভুল; সেই ব্যবস্থা কার্যকরী করার ফলে মানুষ এমন একটি সমাজে বাস করবে যেখানে কোনো অন্যায় থাকবে না, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোনো প্রকার অন্যায় থাকবে না, অবিচার থাকবে না, যেখানে জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তা হবে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত;

যেখানে চিন্‌v, evK-¯vaxbZv I e¨w³ স্বাধীনতা হবে সংরক্ষিত এবং মানুষে মানুষে সংঘাত, দ্বন্দ্ব, রক্তপাত থাকবে না। অবশ্য যেহেতু মানবজাতির মধ্যে ভালো-মন্দ সব রকম লোকই থাকে, সেহেতু এটা শতকরা ১০০ ভাগ অর্জন করা সম্ভব নয়, কিন্তু জীবনব্যবস্থার নির্ভুলতা বা সঠিকতার ফলে যদি অপরাধ, অন্যায়, অবিচার এবং মানুষে মানুষে সংঘর্ষ I i³cvZ wbæZg পর্যায়ে, শতকরা ১% বা ২% এ নেমে আসে, তবে তা-ই যথেষ্ট। এমন একটি নিখুঁত জীবনব্যবস্থাই আল্লাহ নাজেল করেছেন তাঁর শেষ রসুলের মাধ্যমে। স্রষ্টার দেওয়া এই নিখুঁত ত্রুটিহীন জীবনব্যবস্থা কায়েম করলেই মানবজীবনে, আমাদের জীবনে কার্যকরী করলে অন্যায়, অবিচার, অশান্‌, wbivcত্তাহীনতা, অপরাধ, সংঘর্ষ, রক্তপাত প্রায় বিলুপ্ত হয়ে নিরাপদ ও শান্‌ ময় জীবন আমরা পাবো। এই শান্‌ময় অবস্থাটির নামই স্রষ্টা দিয়েছেন ইসলাম, অর্থাৎ শান্‌|
প্রশ্ন হতে পারে যে স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান মানুষের সমাজ জীবনে প্রয়োগ ও কার্যকরী করা হলে জীবনে যে ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হবে তার যুক্তি ও প্রমাণ কি?

এর বহু প্রমাণ আছে। তবে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো ইতিহাস। শেষ নবী মোহাম্মদের (দ.) মাধ্যমে যে শেষ জীবন বিধান স্রষ্টা প্রেরণ করেছিলেন তা মানবজাতির একাংশ গ্রহণ ও সমষ্টিগত জীবনে কার্যকরী করার ফলে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অংশ অর্থাৎ wbivcËv I অর্থনীতিতে কী ফল হয়েছিল তা ইতিহাস। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপত্তা যাকে বলে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মানুষ রাতে শোওয়ার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব KiZ bv, iv¯ায় ধনসম্পদ ফেলে রাখলেও তা পরে যেয়ে যথাস্থানে পাওয়া যেত, চুরি, ডাকাতি, nZ¨v, ivnvRvbx cvয় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল, আদালতে মাসের পর মাস কোনো অপরাধ সংক্রান্‌ মামলা আসত না। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হয়ে গিয়েছিল। এই স্বচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ যাকাত ও সদকা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে iv¯vq iv¯ায় ঘুরে বেড়াত কিন্তু সেই টাকা গ্রহণ করার মতো লোক পাওয়া যেত না। শহরে নগরে লোক না পেয়ে মানুষ মরুভূমির অভ্যন্‌রে যাকাত দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াতো। এটি ইতিহাস। মানবরচিত কোনো জীবনব্যবস্থাই এর একটি ভগ্নাংশও মানবজাতিকে উপহার দিতে পারে নাই।

শান্‌ময় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য সর্ব প্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হচ্ছে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা। তারপর ক্রমান্বয়ে আসে অর্থনৈতিক সুবিচার, তারপর ক্রমান্বয়ে আসে রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সুবিচার। এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে।

জড়বাদী পাশ্চাত্যের চিন্‌vi cfvevaxb mg¯ পৃথিবীতে এখন বোধহয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই gvbyষের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দু'চার শতাব্দী আগে পর্যন্‌|

প্রাচ্যের বৌদ্ধ, জৈন, সনাতন ধর্মী ভারতীয়দের কাছে অর্থনীতির অত গুরুত্ব ছিল না, পার্থিব জীবনের চেয়ে আত্মার ও চরিত্রের উৎকর্ষের সম্মান ছিল বেশি। একজন কোটিপতির চেয়ে একজন জ্ঞানী, চরিত্রবান কিন্তু গরীব লোককে সমাজ অনেক বেশি সম্মান করত। আর শেষ 'দীন ইসলাম' হলো ভারসাম্যযুক্ত (Balanced)| mg¯ দীনটাই ভারসাম্যপূর্ণ। যে জন্য এই জাতিটাকে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন ভারসাম্যযুক্ত জাতি বলে (সুরা বাকারা ১৪৩)। অর্থাৎ এর উভয় জীবনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিষ্টধর্মের বিফলতার জন্য যখন ইউরোপ জাতীয় জীবন থেকে এটাকে বাদ দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে এক নীতি উদ্ভাবন করে নিলো, তখন ওটার A_bxZ ধার করল ইহুদিদের কাছে থেকে। করতে বাধ্য হলো; কারণ খ্রিষ্টধর্মে ইহলৌকিক কোনো আইন কানুন নেই সুতরাং অর্থনীতিও নেই। ঈসা (আ.) এসেছিলেন শুধুমাত্র ইহুদিদের আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য; ইহুদিদের জাতীয় অর্থাৎ রাজনৈতিক আর্থ-mvgwRK AvBb `Ênewa BZ¨w` মোটামুটি অবিকৃতই ছিল। ইউরোপ ইহুদিদের কাছে থেকে অর্থনীতি ধার নিলেও অবিকৃত অবস্থায় নিল না। তারা ওটার মধ্যে সুদ প্রবর্তন করে ধনতন্ত্রে পরিবর্তন করে নিলো। এ কাজটা অবশ্য ইহুদিরা আগেই করে নিয়েছিল মুসার (আ.) ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে। মানুষের তৈরি ব্যবস্থা সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে না, কাজেই এই অর্থনীতিও পারল না। ফল হলো অন্যায়-শোষণ, জাতীয় সম্পদের অসম বণ্টন। এই অন্যায় যখন মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করল তখন তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল আরেক অন্যায়; কার্ল মার্কসের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, কমিউনিজম। এটাও সেই মানুষের তৈরি ব্যবস্থা সুতরাং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সেই অন্যায়, শুধু Ab¨ রকমের অন্যায়। এই ব্যবস্থাও মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা ছাড়া কারো তৈরি ব্যবস্থা প্রকৃত সমাধান দিতে পারে না, পারবে bv|

এই দীনের অর্থনীতির মূল ভিত্তি আল্লাহ মেহেরবানি করে বুঝতে দিয়েছেন; শুধু সেইটুকুই আমি লিখছি তার বেশি নয়। ভিত্তি বলতে আমি বোঝাচ্ছি-নীতি, যে নীতির উপর একটা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্রের নীতি হলো জনসাধারণের সম্পদ সাপটে এনে এক বা একাধিক স্থানে জড়ো করা। সমাজতন্ত্রের নীতি হলো জনসাধারণের সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে তুলে নেওয়া। মূলে একই কথা, দু'টোই জনসাধারণকে বঞ্চিত করা। পুঁজিবাদে দেশের, জাতির সম্পদ পুঞ্জিভূত করে সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের হাতে ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে। যার ফলভোগ করে অতি অল্পসংখ্যক লোক এবং তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বঞ্চিত করে বিরাট ধনী হয়ে যায়। আর সমাজতন্ত্র দেশের জাতির সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাষ্ট্রের হাতে। জনসাধারণকে দেয় তাদের শুধু খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা, বাসস্থানের মতো প্রাথমিক, মৌলিক প্রয়োজনগুলি, যদিও কার্যক্ষেত্রে তাও সুষ্ঠুভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদ পুঞ্জিভূত করে হাতে গোনা কতকগুলি কোটিপতি সৃষ্টি হয়, বাকি জনসাধারণ জীবনের প্রাথমিক মৌলিক প্রয়োজনগুলি থেকেও বঞ্চিত হয়। এই ব্যবস্থা যতটুকু পরিধিতে প্রয়োগ করা হবে ততটুকু পরিধিতেই ঐ ফল হবে। একটি

ভৌগোলিক রাষ্ট্রে (Nation State) এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে যেমন ঐ রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভীষণ দারিদ্র্যের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় কোটিপতি সৃষ্টি হবে ঠিক তেমনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পৃথিবীময় প্রয়োগ করলে কয়েকটি ভৌগোলিক রাষ্ট্র বিপুল ধনী হয়ে যাবে আর অধিকাংশ রাষ্ট্র চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হবে যেমন বর্তমানে হয়েছে। এর কারণ হলো একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রের সম্পদ যেমন সীমিত- তেমনি পৃথিবীর সম্পদও সীমিত। সীমিত যে কোনো জিনিসকেই কোথাও একত্রিত করা, পুঞ্জিভূত করা মানেই অন্যস্থানে অভাব সৃষ্টি করা। একটা রাষ্টের ভেতরই হোক, Avi mg¯ পৃথিবীতেই হোক, সেটার সম্পদ, যা সমস্ মানব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকার কথা, সেটাকে যদি কোথাও পুঞ্জিভূত করা হয় তবে অন্যত্র অভাব সৃষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সমাজবাদী, cwRev`x I KwgDwb÷ (Socialist, Capital & Communist) এই সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মানুষের তৈরি, গায়রুল্লাহর ব্যবস্থা। সুতরাং এর পরিণাম অবশ্যই অন্যায়-AwePvi| অন্যদিকে শেষ জীবন-ব্যবস্থায় অর্থনীতির প্রণেতা স্বয়ং স্রষ্টা, আল্লাহ। এই ব্যবস্থার ভিত্তি নীতি হচ্ছে সম্পদকে মানুষের মধ্যে দ্রুত গতিতে চালিত করা, কোথাও সঞ্চিত হতে না দেওয়া। পুঁজিবাদ বলছে সম্পদ খরচ না করে সঞ্চয় করো; সবার সঞ্চয় একত্র করো, পুঞ্জিভূত করো (ব্যাংকে), আল্লাহ কোর'আনে বলছেন খরচ করো, ব্যয় করো, সম্পদ জমা করো না, পুঞ্জিভূত করো না। অর্থাৎ ইসলামের অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঠিক বিপরীত। একটায় সঞ্চয় করো অন্যটায় ব্যয় করো। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী অর্থনীতি ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ করে RwZi mg¯ সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে পুঞ্জিভূত করে। এটাও ইসলামের বিপরীত। কারণ, ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণ স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে না। পুঁজিবাদের ও সমাজতন্ত্রের যেমন আলাদা নিজস্ব অর্থনীতি আছে তেমনি ইসলামের নিজস্ব অর্থনীতি আছে। এককথায় বললে বলতে হয় সেটা হচ্ছে সম্পদকে যত দ্রুত সম্ভব চালিত করা, কোথাও যেন সেটা স্থবির-অনড় না হতে পারে। এই জন্যই কোর'আনে এই অর্থনীতির বিধাতা, বিধানদাতা বহুবার তাগিদ দিয়েছেন খরচ করো, ব্যয় করো, কিন্তু বোধহয় একবারও বলেন নি যে, সঞ্চয় করো। যাকাত দেয়া, খারাজ, খুমস ও ওশর দেয়া এবং তার উপর সাদকা দান ইত্যাদি খরচের কথা এতবার তিনি বলেছেন যে, বোধহয় শুধুমাত্র তওহীদ অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে প্রভু, হুকুমদাতা, এলাহ বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা এবং জেহাদ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে এতবার বলেন নি। কারণ, একটা জাতির এবং পরবর্তীতে সমগ্র পৃথিবীতে অর্থাৎ যে কোনো পরিধিতে সম্পদ যথাযথ এবং বণ্টনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সঞ্চয় নয়, ব্যয়। একজনের হাত থেকে অন্য জনের হাতে হস্তান্i, A_vr MwZkxjZv| cwZwU n¯ান্র যত দ্রুত হতে থাকবে তত বেশি সংখ্যক লোক ঐ একই সম্পদ থেকে লাভবান হতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ধরুন একটা এক টাকার নোট। এই নোটটা যার হাতেই পড়ল, সে যথা সম্ভব শীঘ্র সেটা খরচ করে ফেলল। সে খরচ যেমন করেই হোক, কোনো কিছু কিনেই হোক বা দান করেই হোক বা কাউকে ধার দিয়েই হোক বা কোনো ব্যবসাতে বিনিয়োগ করেই হোক। ঐ নোটটা যদি সকাল থেকে রাত পর্যন্ দশজন লোকের হাত বদলায় তবে ঐ এক দিনে নোUUv `kRb লোককে লাভবান করবে। আর যদি একশ' জনের হাত বদলায় তবে একশ' জনকে লাভবান করবে। কারণ প্রতিবার হাত বদলাবার সময় দু'জনের মধ্যে একজনকে অবশ্যই লাভবান হতেই

হবে। অর্থাৎ ঐ সীমিত সম্পদটা অর্থাৎ ঐ এক টাকার নোটটা যত দ্রুত গতিতে হাত বদলাবে যত দ্রুত গতিতে সমাজের মধ্যে চালিত হবে তত বেশি সংখ্যক লোককে লাভবান করবে; তত বেশি সংখ্যক লোক অর্থনৈতিক উন্নতি করবে এবং পরিণতিতে সমস্ সমাজকে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত করবে, সম্পদশালী করবে।

ঐ গতিশীলতার জন্য যে কোনো পরিধির সীমিত সম্পদ সমাজে নিজে থেকেই সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হয়ে যাবে কোথাও পুঞ্জিভূত হতে পারবে না এবং হবার দরকারও নেই। সম্পদের এই গতিশীলতার জন্য নিজে থেকেই সুষম-সুষ্ঠু বণ্টন হয়ে যাবার কারণে একে রাষ্ট্রায়ত্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই, ব্যক্তির মালিকানাকে নিষেধ করারও কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যক্তি মালিকানা নিষিদ্ধ করার কুফল, যে কুফলের জন্য রাশিয়া আজও খাদ্যে-পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে নি এবং আজও আমেরিকা থেকে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হয়, সে কুফলও ভোগ করতে হয় না। যা হোক, উদাহরণ স্বরূপ যে এক টাকার নোটের কথা বললাম, সেই নোটটা যদি সমস্ দিনে কোনো হস্ান্র না হয়ে কোনো লোকের পকেটে বা কোনো ব্যাংকে পড়ে থাকে তবে ওটার Avmj gj¨ GK Uকরো বাজে ছেঁড়া কাগজের সমান। কারণ সারাদিনে সেটা সমাজের মানুষের কোনো উপকার করতে পারল না, কারো অথর্নৈতিক উন্নতি করতে পারল না। আবার বলছি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের অর্থনীতির বুনিয়াদ-ভিত্তি হলো সম্পদের দ্রুত থেকে দ্রুততর MwZkxjZv (Fast and still faster circulation of wealth)|

কেউ বলতে পারেন- কেন? টাকার নোটটা অর্থাৎ সম্পদ পকেটে থেকে গেলে, বাক্সে ভরে রাখলে না হয় বুঝলাম ওটা উৎপাদনহীন, নিষ্ফল হয়ে গেল কিন্তু ব্যাংকে জমা পুঁজি তো বিনিয়োগ করা হয় এবং তা উৎপাদনে লাগে। ঠিক কথা কিন্তু ব্যাংকে জমা করা ঐ পুঁজি বিনিয়োগের গতি ¯vaxb g³ n¯ান্রেরের চেয়ে বহু কম, কোনো তুলনাই হয় না। ব্যাংকের সম্পদ বিনিয়োগ করতে বহু তদন্, AvBb-কানুন লাল ফিতার দৌরাত্ম এবং তারপরও ঐ বিনিয়োগের সুফল ভোগ করে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ। শুধু ঐ শ্রেণিটি- যে শ্রেণিটি ইতিমধ্যেই সম্পদশালী, জনসাধারণের অনেক ঊর্ধ্বে। ব্যাংক কি যে চায় তাকেই পুঁজি ধার দেয়? অবশ্যই নয়। যে লোক দেখাতে পারবে যে, তার আগে থেকেই যথেষ্ট সম্পদ আছে কিন্তু আরো চাই, শুধু তাকেই ব্যাংক পুঁজি ধার দেয়, এটা সবারই জানা। যার কিছু নেই, যে ব্যাংকের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ বন্ধক দিতে পারবে না তাকে ব্যাংক কখনো পুঁজি ধার দেয় না, দেবে না। এক কথায় তৈলাক্ত মাথায় আরও তেল দেয়া, ধনীকে আরো ধনী করা, গরীবকে আরও গরীব করা। সুতরাং ঐ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন অসম্ভব। শেষ ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনসাধারণকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হয় নি সমাজতান্ত্রিকব্যবস্থার মতো। জনসাধারণকে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কোনো অর্থনৈতিক উদ্যোগ-প্রচেষ্টাকেও নিষিদ্ধ করতে হয় নি। কারণ সম্পদের ঐ দ্রুত গতিই কোথাও সম্পদকে অস্বাভাবিকভাবে পুঞ্জিভূত হতে দেবে না। পানির প্রবল স্রোত যেমন বালির বাঁধ ভেঙ্গে দেয়, সম্পদের স্রোত তেমনি কোথাও সম্পদকে স্তুপীকৃত হতে দেবে না। অথচ ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উদ্যোগ প্রচেষ্টার যে শক্তিশালী সুফল তারও ফল ভোগ করবে সমাজ। যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে

নিষিদ্ধ করার ফলে আজ সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, আজ তারা বাধ্য হচ্ছে মানুষকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মালিকানার অধিকার ফিরিয়ে দিতে। আমাদের দেশের উদাহরণ দেওয়া যায়। এদেশের মানুষ যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জীবিকার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠায় তখন সে অর্থ স্বভাবতই দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, পৃথিবীতে মানুষের বিচরণ ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বাধা তুলে নিলে সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিই সমৃদ্ধ হতো।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদ, পরিণাম হচ্ছে নিষ্ঠুর, অমানবিক অর্থনৈতিক অবিচার, একদিকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে বিপুল সম্পদ, তাদের পাশবিক ভোগ বিলাস; অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের কঠিন দারিদ্র্য, অর্ধাহার-Abwnvi-gনবেতর জীবনযাপন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে সমস্ সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার হরণ করে সম্পদ বণ্টন। এ বণ্টন শুধু মৌলিক প্রয়োজনের এবং তা-I H মানুষের শ্রম ও উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে। পরিণাম হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, ও ক্ষুদ্র বাসস্থানের বিনিময়ে সংখ্যাগরিষ্ট জনসাধারণের আত্মাহীন যন্ত্রে পরিণত হওয়া ও মুষ্টিমেয় নেতৃবৃন্দের ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে ঐ বঞ্চিত কৃষক শ্রমিক জনসাধারণের নেতৃত্ব করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। ঐ দুই ব্যবস্থাই মানুষের-গায়রুল্লাহর সৃষ্টি এবং দুটোরই পরিণাম বৃহত্তর জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর অবিচার, বঞ্চনা। শেষ দীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে mg¯ সম্পদকে যত দ্রুত সম্ভব গতিশীল করে দেওয়া এবং অর্থনীতিকে স্বাধীন-মুক্ত করে দেওয়া। প্রত্যেক মানুষের সম্পদ সম্পত্তির মালিকানা স্বীকার করা, প্রত্যেকের অর্থনৈতিক উদ্যোগ-প্রচেষ্টাকে শুধু স্বীকৃতি দেওয়া নয় উৎসাহিত করা (সুরা বাকারা ২৭৫)। একদিকে A_নৈতিক উদ্যোগ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকে আল্লাহ উৎসাহিত করছেন অন্যদিকে ক্রমাগত বলে চলেছেন খরচ কর, ব্যয় কর। উদ্দেশ্য সেই গতিশীল সম্পদের নীতি। পরিণাম সমাজের সর্বস্তরে সম্পদের সুষ্ঠু-সুষম বণ্টন, দারিদ্র্যের ইতি। প্রশ্ন হতে পারে এই নীতি অর্থাৎ সম্পদকে দ্রুত গতিশীল করে দিলে যে সম্পদের অমন সুষ্ঠু বণ্টন হয়ে মানুষের দারিদ্র্য লুপ্ত হয়ে যাবে, তার প্রমাণ কি? এর জবাব হচ্ছে ক) স্রষ্টার দেয়া নীতি এবং ব্যবস্থাকে অবশ্যই নির্ভুল ও সঠিক বলে গ্রহণ করতে হবে, নইলে তা যুক্তি-সঙ্গত হবে না। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ভুল করছেন এটা যুক্তিসঙ্গত নয় (Fallacious)। তিনি নিজেই বলেছেন "যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমরা কি তার চেয়ে বেশি জান?" তারপর নিজেই তার জবাব দিচ্ছেন "তিনি সর্বজ্ঞ" (সুরা মূলক ১৪)। এ যুক্তির কোনো জবাব নেই। খ) এই অর্থনীতি যখন প্রয়োগ হয়েছিল, তখন তার কী ফল হয়েছিল তা ইতিহাস। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে-gvbl hvKিত দেবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতো, লোক পেত না।

আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তায় বা তাঁর অসীম জ্ঞানের সম্বন্ধে যারা বিশ্বাসী নন তারা যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, চৌদ্দশ' বছর আগে মানবসমাজের যে অবস্থা ছিল সেখানে হয়তো এই জীবনব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছিল এবং ঐ অকল্পনীয় ফল দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের, প্রযুক্তির যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এখন ঐ পুরনো ব্যবস্থা আর সেরূপ ফল দেখাতে পারবে না; এখন মানুষকেই চিন্তাভাবনা করে তার জীবনব্যবস্থা তৈরি করে নিতে হবে এবং আমরা তা-ই নিচ্ছি।

এর জবাব হচ্ছে এই যে, এই দীনের সমস্ত ব্যবস্থা সমস্ত AvBb-Kvbb `Êwewa mg¯ই প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এর এক নাম দীনে ফিতরাত, প্রাকৃতিক জীবন-ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক নিয়ম অপরিবর্তনীয়। প্রাকৃতিক নিয়ম-আইন লক্ষ বছর আগে যা ছিল আজও তাই আছে, লক্ষ বছর পরেও তাই থাকবে। অবস্থার পারিপার্শ্বিকতায় বহু বিষয় বদলে যায়। অনেক বিষয় AMnণযোগ্য ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। কিন্তু অনেক বিষয় আছে যা চিরন্তb, AcwieZbxq, শাশ্বত, এর কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন: একটি মানুষের নাকে সজোরে ঘুসি মারলে তার নাক দিয়ে রক্ত বের হবে, লক্ষ বছর আগে এই ঘুষি মারলে তখনও রক্ত বের হতো, আজও বেরোয়, লক্ষ বছর পরেও মানুষের নাকে ঘুষি মারলে রক্ত বেরোবে। এর কোনো পরিবর্তন নেই। তেমনিভাবে জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদ মানুষ সমাজে যে ক্ষতি করে, ধনী-দরিদ্রের যে বৈষম্য বৃদ্ধি করে তা লক্ষ বছর আগেও কোরত, এখনও করছে এবং আজ থেকে লক্ষ বছর পরেও এই সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি মানবজীবনে প্রয়োগ করলে একই বিষময় ফল সৃষ্টি করবে। আগুনের পোড়াবার শক্তি লক্ষ বছর আগে যা ছিল, আজও তাই আছে এবং লক্ষ বছর পরেও অপরিবর্তনীয়ভাবে তা-ই থাকবে। এমনি বহু জিনিস আছে যা শাশ্বত অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ এই শেষ জীবনবিধান (দীন) তেমনি সেইসব অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা পৃথিবীর বাকি আয়ুষ্কালের মধ্যে পরিবর্তন হবে না। এই জন্য এই দীনের এক নাম দীনুল ফেতরাহ বা প্রাকৃতিক দীন (কোর'আন, সুরা রূম ৩০)। এই জীবনব্যবস্থার প্রতিটি আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ তিনি অতি সতর্কতার সঙ্গে ঐ সব অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে মানবজাতির বাকি আয়ুষ্কালের মধ্যে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন না থাকে। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্তনীয় যা কিছু ইতিপূর্বে প্রেরিত জীবনব্যবস্থাগুলিতে ছিল তার কোনোটিই এতে স্থান পায় নাই, এতে শুধু অপরিবর্তনীয় শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলিই স্থান পেয়েছে। কাজেই চৌদ্দশ' বছর আগে এই জীবনব্যবস্থা মানুষের জীবনে প্রয়োগে যে ফল হয়েছিল, বর্তমানে প্রয়োগ করলেও সেই একই ফল হবে এবং লক্ষ বছর পরে প্রয়োগ করলেও সেই অকল্পনীয় ফলই হবে। তবে একটি বিষয় পাঠককে মনে রাখতে হবে, এখানে আমি যে জীবনব্যবস্থা (দীন) প্রতিষ্ঠার কথা বলছি আর বর্তমানে ইসলাম বলে যে ধর্মটি চালু আছে এই দু'টি এক জিনিস নয়। আমি সেই প্রকৃত ইসলামের কথা বলছি যা আল্লাহ তাঁর রসুলের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লেখা বইগুলি পড়ার অনুরোধ করছি।

আরও একটি প্রশ্ন হতে পারে- সেটা হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যদি সঠিক না হয়ে থাকে তবে ঐ e¨বস্থায় পাশ্চাত্য জাতিগুলি এত প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছে কেমন করে? এর জবাব হচ্ছে ক) পাশ্চাত্যের অতি ধনী জাতিগুলির মধ্যেও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নেই, ওসব দেশে একটা ক্ষুদ্র শ্রেণি প্রচণ্ড ধনী, কোটি কোটি ডলার পাউণ্ডের মালিক, কিন্তু প্রতি দেশে গরীব, অতি গরীব, বস্িevmx আছে ভিখারী আছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ও সব দেশে গরীবের সংখ্যা কম; ভিখারীর সংখ্য কম এবং সার্বিকভাবে সমাজ প্রাচুর্যের মধ্যেই বাস করে। কিন্তু এর কারণ আছে, বিবিধ কারণের মধ্যে সর্ব প্রধান কারণ হলো পাশ্চাত্যের ঐ জাতিগুলি এক সময়ে প্রায় সমস্ পৃথিবীটাকে সামরিক শক্তি বলে অধিকার করে কয়েক শতাব্দী ধরে শাসন ও শোষণ করে নিজেরা ধনী হয়েছে। ঐ শোষিত দেশগুলির সম্পদ জড়ো হয়েছে ঐসব দেশে। কাজেই স্বভাবতই অত সম্পদ উপচে পড়ে সমাজের অনেকটাকেই সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এ অস্বাভাবিক অবস্থা অর্থনৈতিক সুবিচার নয়। মানব জাতির জন্য সুষম বণ্টন নয়। এখানে একটা বিষয়ে মনে রাখতে হবে। এই দীন এসেছে সমস্ পৃথিবী, সমগ্র মানব জাতির জন্য, কাজেই এর দৃষ্টিক্ষেত্র পৃথিবীময় সমভাবে ব্যাপ্ত; কোনো ভৌগোলিক সীমানে বা জাতিতে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থনৈতিক সুষম-বণ্টনের অর্থ ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ মানব জাতির মধ্যে সুষম বণ্টনে। পুঁজিবাদ সম্বন্ধে পেছনে বলে এসেছি, সম্পদ কোনো স্থানে জড়ো করা মানেই অন্য স্নে অভাব সৃষ্টি করা। প্রাচ্যের দেশগুলিকে নিঃস্ব করেই পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে। এটা অর্থনৈতিক সুবিচার নয়, এটা ঘোরতর অন্যায়।

মানুষের অর্থনীতির সঙ্গে লোকসংখ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, যেমন রয়েছে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ। সবগুলিই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং একটv AciUvi Dci wbfikxj| Gi কোনোটারই একক কোনো সমাধান সম্ভব নয়। শেষ ইসলামেও তাই; এবং যেহেতু এটা সমস্ পৃথিবী এবং সম্পূর্ণ মানবজাতির জন্য এসেছে, তাই এর সমস্ weavb, mg¯ সমাধানেরই পটভূমি গোটা পৃথিবী। কোনো সীমিত পরিধির মধ্যে এর প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে ফলদায়ক হবে না। ïa আংশিকভাবে হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো ভৌগোলিক রাষ্ট্রে (Nation State) Gi ïa অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে ঐ রাষ্ট্রে প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতি হবে সম্পদের যথেষ্ট সুষম বণ্টন হবে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ ভৌগোলিক সীমানা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে mg¯ মানব জাতিকে এক মহা জাতিতে পরিণত করে দিলে যতখানি উন্নতি হবে, যত সুষম সম্পদ বণ্টন হয়ে সমস্ বৈষম্য মিটে যাবে তেমন হবে না। এইজন্য শেষ ইসলামে সম্পদ কোথাও পুঞ্জিভূত করা যেমন নিষিদ্ধ তেমনি নিষিদ্ধ পৃথিবীর বুকের উপর কাল্পনিক দাগ টেনে টেনে এক মানব জাতিকে বহু ভৌগোলিক রাষ্ট্রে বিভক্ত করে কোথাও অতিরিক্ত RbmsL¨vi Rb¨ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করা, আর কোথাও জনবিরল করে রাখা। স্রষ্টার দেয়া বিধান অস্বীকার করে আজ পৃথিবীময় দু'টোই করা হচ্ছে এবং তার পরিণামে কোনো ভৌগোলিক রাষ্ট্র অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে চরম দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হচ্ছে আর কোনো ভৌগোলিক রাষ্ট্রের অতি অল্প RbmsL¨v তাদের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে মহানন্দে বাস করছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সম্পদের সুষম-বণ্টন হচ্ছে না। এই মহা-অন্যায় রোধ করার জন্য আল্লাহ যে বিধান মানুষকে দিয়েছেন সেটার অর্থনৈতিক নীতি যেমন সম্পদকে কোথাও একত্রীভূত না করে সেটাকে অবিশ্রান্

ভাবে সমস্ পৃথিবীময় ঘূর্ণায়মান রাখা (Fast circulating) তেমনি রাজনৈতিক নীতি হচ্ছে জনসংখ্যা বেড়ে যেয়ে মানুষ যেন কোথাও পুঞ্জিভূত না হয় সেজন্য ভৌগোলিক সীমান্ wbwl× করা। এক বালতি পানি মাটিতে (পৃথিবীতে) ঢেলে দিলে ঐ পানি চারদিকে ছড়িয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই (ফিতরাত) যেখানে গর্ত (দারিদ্র্য) থাকবে সেটা ভরে দেবে, যেখানে উঁচু (সমৃদ্ধি) থাকবে সেখানে যাবে না এবং ঐ পানি নিজে থেকেই তার সমতল খুঁজে নেবে। ঐ বালতির পানিকে জনসংখ্যা ও সম্পদ বলে ধরে নিলেই শেষ ইসলামের অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যার ব্যাপারে নীতি পরিষ্কার বোঝা যাবে। যতদিন মানুষ আল্লাহর দেয়া অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ না করবে ততোদিন দ্রারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের ব্যবধান ঘুঁচবে না, আর যতদিন মানুষ ÔGK RwZÕ- এই নীতি গ্রহণ করে সমস্ ভৌগোলিক সীমান্ মিটিয়ে না দেবে ততোদিন পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ-যুদ্ধ ও রক্তপাত বন্ধ হয়ে শান্তি (ইসলাম) আসবে না। এই হচ্ছে কঠিন সত্য। ইসলামের শেষ সংস্কণের অথনীতি সম্বন্ধে আর দু'একটা কথা বলে শেষ করছি। পুঁজির ঠিক বিপরীত অর্থাৎ ব্যয় করার উপর এই অর্থনীতি ভিত্তি করা হলেও ব্যক্তির সম্পদ সম্পূর্ণ ব্যয় করে নিজে রিক্ত হয়ে যাওয়াও এর নীতি নয়। এই নীতির প্রণেতা আল্লাহ বলছেন- মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেল (সুরা বাকারা ২১৯)। কিন্ আবার সতর্ক করে দিয়েছেন-"তারা (মো'মেনরা) যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না কিন্তু কার্পণ্যও করে না। তাদের ব্যয় করা মধ্যপন্থায় (সুরা ফোরকান ৬৭।)।" আবার বলছেন- তোমাদের হাতকে কাঁধের সাথে কুঁচকে রেখো না, [এটা আরবি ভাষার একটা প্রকাশভঙ্গী (Idiom) যা কার্পণ্য বোঝায়], আবার একেবারে প্রসারিতও করে দিওনা (সুরা বনি-BmivBj ২৯)।" অর্থাৎ নিজেদের প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে সব দান করে নিজেরা নিঃস্ব হয়ে যেও না। শেষ ইসলামের সমস্ কিছুর মধ্যে যে ভারসাম্যের আল্লাহ বলেছেন এখানেও সেই ভারসাম্য, 'মধ্যপথ' (সুরা বাকারা ১৪৩) সেরাতুল মোস্বKxg|

ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে অমানবিক, এটা যে ধনীকে আরও ধনী গরীবকে আরও গরীব করে, একথা আজ যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করার দরকার নেই। এই ব্যবস্থার নিষ্ঠুর পরিণতি দেখেই মানুষ বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজেছিল, যদি উম্মতে মোহাম্মদী তাদের উপর আল্লাহর রসুলের অর্পিত দায়িত্ব ত্যাগ করে পরিণামে একটি বিচ্ছিন্ন ঐক্যহীন, অশিক্ষিত, ঘৃণ্য জাতিতে পরিণত না হতো তবে পুঁজিবাদের বিকল্প ব্যবস্থা মানুষকে খুঁজতে হতো না। তাদের উপর আল্লাহর দেয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উম্মতে মোহাম্মদীই প্রতিষ্ঠা করে সর্ব রকম অর্থনৈতিক অবিচার নির্মূল করে দিতো। যাই হোক, উম্মতে মোহাম্মদী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় মানুষকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হলো এবং সেটা করা হলো এবং স্বভাবতই সেটা ঐ পুঁজিবাদের মতোই হলো মানুষ দ্বারা সৃষ্ট এবং সেটার স্রষ্টা হলেন কার্ল মার্কস। জয়জয়কার পড়ে গেল- পাওয়া গেছে, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান পাওয়া গেছে। আর অর্থনৈতিক অবিচার হবে না, প্রতিটি মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সমান হবে, কেউ প্রাচুর্যে বিলাসে কেউ দারিদ্রে বাস করবে না। বলা হলো এই হচ্ছে স্বর্গরাজ্য। কিন্তু হয়েছে কি? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নেতারা এবং সাধারণ নাগরিক শ্রমিক-কৃষক একই মানের জীবন যাপন করেন কি? একই মানের খাবার খান কি? একই রকম পোষাক পরিচ্ছদ পরেন কি?

অবশ্যই নয়। এই কথায় গত মহাযুদ্ধের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল মস্কো গিয়েছিলেন, কমিউনিস্ট রাশিয়ার রাষ্ট্রনেতা জোসেফ স্ট্যালিনের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে বুদ্ধি পরামর্শ করার জন্য। ক্রেমলিনের বিরাট প্রাসাে বসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে করতে গভীর রাত্রে চার্চিলের ক্ষিধে পেয়ে গেল, যদিও রাত্রের প্রথম দিকে তারা যে ভোজ খেয়েছিলেন তা রাশিয়ার সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক জীবনেও দেখেনি। যাই হোক, ক্ষিধে চাপতে না পেরে চার্চিল বলেই ফেললেন যে কিছু না খেলে আর চলছে না। খাওয়া-`vIqvi cট আগেই চুকে গিয়েছিল বলে স্ট্যালিন আর কাউকে ডাকাডাকি না করে উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে ভেড়ার একটি আস্ রানের রোস্ট বের করে এনে টেবিলে রাখলেন। চার্চিল তো চার্চিলই, এক হাত নেবার লোভ সামলাতে পারলেন না। রোস্ট চিবুতে চিবুতে বললেন "ইস্! কবে আমি এমন করতে পারব যে ইংল্যান্ডের পতিটি ঘরে ফ্রিজের মধ্যে এমনি ভেড়ার রানের রোস্ট থাকবে"। স্ট্যালিনের গালে এটা ছিল একটা মারাত্মক চড়। অর্থনৈতিক সাম্যবাদের দেশে রাশিয়ার ঘরে ঘরে ফ্রিজের মধ্যে রানের রোস্ট নেই, স্ট্যালিনের প্রাসাদের ফ্রিজে আছে। কিন্তু বলার কিছু ছিল না। স্ট্যালিনকে চুপ করে চড়টা হজম করতে হয়েছিল। ÷¨wjn যখন চার্চিলকে রানের রোস্ট খাওয়াচ্ছিলেন ও খাচ্ছিলেন, তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে। হিটলারের বাহিনী মস্কোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। লক্ষ লক্ষ রাশিয়ান অর্ধাহারে অনাহারে থেকে প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার সৈনিক প্রচণ্ড শীতে জমে মারা পড়ছে। অনেকটা অনুরূপ অবস্থায় এই শেষ জীবন-e¨eস্থার নেতারা কী করেছেন তার একটা তুলনা দেয়া দরকার। GB Bmjvg hLb Bmjvg wQj- অর্থাৎ বিশ্বনবীর কাছ থেকে যারা সরাসরি শিক্ষা-MnY করেছিলেন, তাদের অন্যতম, দ্বিতীয় খলিফা ওমরের (রা.) সময় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। যতদিন দুর্ভিক্ষ ছিল ততোদিন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ যেমন অর্ধাহারে অনাহারে থাকে তিনিও তেমনি থাকতেন। ওমর (রা.) প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন না জনসাধারণ এমন অবস্থায় পৌঁছবে যে তারা ভালো করে খাবার পরও উদ্বৃত্ত থাকবে ততোদিন তিনি গোশত-মাখন এমনকি দুধ পর্যন্ খাবেন না এবং খানও নি। তিনি বলতেন "আমি যদি ঠিকমত খাই তবে আমি কী করে বুঝব Avgvi RwZ Kx Kó mnv করছে?" এই অর্ধাহারে অনাহারে থেকে খলিফা ওমরের (রা.) মুখ রক্তশূন্য ও চুপসে গিয়েছিল। এই ঘটনা ও ওমরের (রা.) ঐ কথাগুলো ঐতিহাসিক সত্য। (ইসলামের কঠোর বিরুদ্ধবাদী, মহানবীকে (দ.) প্রতারক, ভণ্ড বলে প্রমাণ করা চেষ্টায় প্রথম সারির লেখক স্যার উইলিয়াম মুইর এর Annals of Early Caliphate Gi 232-233 পৃ. দেখুন।)

দু'টো জীবনব্যবস্থা (দীন); দু'টোরই দাবি হচ্ছে মানুষের মধ্যকার অন্যায় অবিচার, বিলুপ্ত করা। দু'টোর নেতাদের মধ্যে অতবড় তফাৎ কেন? সভ্যতার ধ্বজাধারী বর্তমানের কোনো ব্যবস্থার রাষ্ট্রের কোনো প্রধান ওমরের (রা.) ঐ উদাহরণ দেখাতে পারবেন, পেরেছেন? অবশ্যB bq| কারণ ও দীনগুলি মানুষের সৃষ্ট, ভারসাম্যহীন-একচোখ বিশিষ্ট। ওগুলো মানুষের দেহের ও আত্মার ভারসাম্য করতে পারে নি। রাষ্ট্রের শক্তিতে একটা ব্যবস্থা মানুষের উপর চাপিয়েছে কিন্তু মানুষের আত্মা, হৃদয়কে দোলাতে পারে নি, পারবেও না, তাই ব্যর্থ। এর অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে যেসব দেশে সমাজতন্ত্র I mvg¨ev` (Communism) প্রতিষ্ঠিত সেইসব দেশের সাধারণ

নাগরিকদের আচরণ। ঐসব দেশগুলির নেতৃত্বে যারা আছেন তারা ছাড়া বাকি বিরাট অংশ যার যার 'স্বর্গরাজ্য' থেকে পালাবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। দেয়াল দিয়ে, কাঁটা তারের প্রাচীর দিয়ে সীমান্ত বন্ধ করে, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর কড়া প্রহরা বসিয়ে, এমন কি সীমান্তে মাইন পেতে রেখেও তাদের ফেরানো যায় নি। গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পর্যন্ত সাম্যবাদের পতন পর্যন্ত ÔˉMivR¨Õ থেকে পালাবার চেষ্টায় ঐসব দেশের হাজার হাজার লোক প্রাণ দিয়েছে, আহত হয়েছে। কেমন সে স্বর্গ-যেখান থেকে মানুষ পালাবার জন্য জীবন বাজি রাখে, মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়!

দাজ্জালের জান্নাত-জাহান্নাম এবং কমিউনিজমের স্বর্গ-biK

১৪০০ বছর ধরে মুসলিম নামধারী জাতিটির ঘরে ঘরে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা চলে আসছে। এ সময়ের মধ্যে দাজ্জাল নিয়ে বহু গবেষণা, বই-cˉক আর ফতোয়ার ছড়াছড়ি হয়েছে। কথিত ধর্মনেতারা তাদের ক্ষুরধার মেধাকে কাজে লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়াজ করেছেন, মানুষকে দাজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আজও করে চলেছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো-সবার অজান্তেই সেই দানব দাজ্জাল ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে এসে গেছে। এমনকি শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে দাজ্জালের এখন যৌবনকাল চলছে। দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে সে Zvi c`vbZ করে রেখেছে; সারা পৃথিবীর মানুষকে সে বাধ্য করেছে তাকে রব (প্রভু) মানতে। কিন্তু তওহীদের ঝাণ্ডাবাহী মো'মেন ছাড়া কেউ তাকে চিনতে পারছে না, আর তাই প্রতিরোধও করছে না। কারণ আল্লাহর রসুল বলেছেন-লেখাপড়া না জানলেও কেবল মো'মেনরাই তাকে চিনতে পারবে, অন্যদিকে কাফের-মোশরেক ব্যক্তি যতই আলেম (জ্ঞানী) হোক না কেন দাজ্জালকে চিনতে পারবে না।

মানবতার মহাশত্রু, ইবলিসের চূড়ান্ত প্রকাশ এই দাজ্জালকে চিহ্নিত করেছেন এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি কোর'আন, হাদীস, বাইবেলসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান ও ইতিহাস দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, পাশ্চাত্যের 'বস্তুবাদী ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা'ই রসুল বর্ণিত দানব দাজ্জাল, যেটাকে তৎকালীন মানুষের বোঝার সুবিধার জন্য রসুলাল্লাহ রূপকভাবে বর্ণনা করেছিলেন। দাজ্জালের জন্ম হয়েছে আজ থেকে ৪৭৭ বছর আগে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে। রাষ্ট্র পরিচালনায় খ্রিষ্টধর্মের ব্যর্থতার কারণে ১৫৩৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক করে জন্ম দেয়া হয় ধর্মনিরপেক্ষতার, যার পরিণত রূপ আজকের ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' বা দাজ্জাল।

সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাত থেকে মানুষের হাতে তুলে নেবার পর সংবিধান, আইন-Kvbb, `Êwewa, A_bxwZ ইত্যাদি তৈরি করে মানব জীবন পরিচালনা আরম্ভ হলো, যার নাম দেয়া হলো ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র (Secular Democracy)। এই গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব রইল মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে। অর্থাৎ মানুষ তার সমষ্টিগত, জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য সংবিধান ও

সেই সংবিধান নিঃসৃত আইন-কানুন প্রণয়ন করবে শতকরা ৫১ জন বা তার বেশি। যেহেতু মানুষকে আল্লাহ সামান্য জ্ঞানই দিয়েছেন সেহেতু সে এমন সংবিধান, আইন-Kvbb `Êwea, অর্থনীতি তৈরি করতে পারে না যা নিখুঁত, নির্ভুল ও ত্রুটিহীন, যা মানুষের মধ্যকার সমস্ Ab¨vq, অবিচার দূর করে মানুষকে প্রকৃত শান্তি (ইসলাম) দিতে পারে। কাজেই ইউরোপের মানুষের তৈরি ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল আইন-কানুনের ফলে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অন্যায় ও অবিচার প্রকট হয়ে উঠলো। বিশেষ করে অর্থনৈতিক জীবনে সুদভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করায় সেখানে চরম অবিচার ও অন্যায় আরম্ভ হয়ে গেল। মুষ্টিমেয় মানুষ ধনকুবের হয়ে সীমাহীন প্রাচুর্য্য ও ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে গেল আর অধিকাংশ মানুষ শোষিত হয়ে দারিদ্র্যের চরম সীমায় নেমে গেল। স্বাভাবিক নিয়মেই ঐ অর্থনৈতিক অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে ইউরোপের মানুষের এক অংশ বিদ্রোহ করল ও গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করল। ইউরোপের মানুষের অন্য একটা অংশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্যান্য দিকের ব্যর্থতা দেখে সেটা বাদ দিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। অর্থাৎ গণতন্ত্র থেকে একনায়কতন্ত্র, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এগুলো সবই অন্ধকারে হাতড়ানো, এক ব্যবস্থার ব্যর্থতায় অন্য নতুন আরেকটি ব্যবস্থা তৈরি করা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিগত জীবনের ধর্মহীনতা অবলম্বন করার পর থেকে যত তন্ত্র (-crac), hZ ev`B (-ism) চালু করার চেষ্টা ইউরোপের মানুষ করেছে সবগুলোর সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতেই ছিল। অর্থাৎ রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, এসবগুলোই মানুষের সার্বভৌমতের বিভিন্ন ধাপ, বিভিন্ন পর্যায় (Phase, step) gvÎ| GB সবগুলো তন্ত্র বা বাদের সমষ্টিই হচ্ছে এই ইহুদী-wLóvb mf¨Zv, `v¾vj|

দাজ্জাল সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে রসুলাল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মত দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর সে যেটাকে জাহান্নাম বলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। তোমরা যদি তার (দাজ্জালের) সময় পাও তবে দাজ্জাল যেটাকে জাহান্নাম বলবে তাতে পতিত হয়ো, সেটা তোমাদের জন্য জান্নাত হবে। [আবু হোরায়রা (রা.) এবং আবু হোযায়ফা (রা.) থেকে বোখারী I gmwjg] Avmb, eZgvb Bûw`-খ্রিষ্টান সভ্যতার সাথে হাদিসটিকে মিলিয়ে দেখি।

eZgvb Bûw`-খ্রিষ্টান সভ্যতা পৃথিবীর মানবজাতিকে বলছে-ôgvbষের সমষ্টিগত জীবন যাপনের জন্য আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ প্রণালীই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের তৈরি করা সংবিধান, সেই সংবিধানের ওপর ভিত্তি করা মানুষের তৈরি করা আইন-Kvbb, `Êwea, A_bxwZ, mgvRbxwZ, wk¶v-ব্যবস্থা ইত্যাদিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আধুনিক। তোমরা এই ব্যবস্থা মেনে নাও, গ্রহণ করো তাহলে তোমরা স্বর্গসুখে বাস করবে, তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসা, জীবনযাত্রার মান এমন উন্নীত হবে, এমন ভোগ-বিলাসে বাস করতে পারবে যে তা জান্নাতের সুখের সমান। আর যদি আমাদের এই নীতি তোমরা গ্রহণ না করো, তবে তোমরা দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর অশিক্ষার মধ্যে জাহান্নামের কষ্ট ভোগ করতে থাকবে।'

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে মানবজাতিকে উপরোক্ত কথা বলছে তা নির্দিষ্ট ঘটনাবলী দিয়ে প্রমাণ করার দরকার করে না। পাশ্চাত্যের সমস্ প্রচার যন্ত্রগুলো এই কথা প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, স্থুল ও সুক্ষ্মভাবে বলে যাচ্ছে যে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা (যার মধ্যে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, mgqাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সাম্যবাদ অন্র্ভুক্ত), তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (যার মধ্যে ধনতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অন্র্ভুক্ত), তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা (যেটা সম্পূর্ণভাবে জড়বাদী, বস্তুবাদী, যেখানে আত্মার শিক্ষার কোনো স্থান নেই), তাদের সামাজিক ব্যবস্থা (যেখানে অবৈধ যৌন KgKvÊ m¤úY ¯vfweK বলে গৃহীত, যেখানে সমকামিতা আইনসঙ্গত), তাদের তৈরি করা দণ্ডবিধি সবই সর্বোত্তম, প্রগতিশীল, আধুনিক। ওর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু হতে পারে না। ওর বাইরে যত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে সব গোঁড়া, পশ্চাৎমুখী, প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে ও হাস্যকর ব্যবস্থা। আল্লাহর রসুল বলেছেন-যারা দাজ্জালের জীবন-ব্যবস্থা স্বীকার করে নেবার ফলে দাজ্জালের জান্নাতে স্থান পাবে তারা দেখবে প্রকৃতপক্ষে তা জাহান্নাম। আর যারা দাজ্জালকে অস্বীকার করার দরুন তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে দেখবে তারা জান্নাতে আছে। আল্লাহর রসুলের কথা সত্য কিনা যাচাই করে দেখা যাক। **এই যাচাইয়ে**i mgq **এ কথা মনে রাখতে হবে যে গণতন্ত্র থেকে ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে সাম্যবাদ (Communism) পর্যন্ পৌঁছলেও প্রকৃতপক্ষে সমগ্রটা মিলিয়ে একটাই বিষয় ইহুদী-**wLóvb **সভ্যতা, দাজ্জাল এবং দাজ্জালের মৃদু থেকে উগ্রতম রূপ। অন্যভাবে বলা যায় জন্ম থেকে দাজ্জালের ক্রমে ক্রমে বড় হওয়া।**

দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই মানুষের একমাত্র গ্রহণযোগ্য সভ্যতা, জীবন-ব্যবস্থা এই প্রচারণায় বিশ্বাস করে যে জনসমষ্টি, জাতি বা দেশ তা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ দাজ্জালের জান্নাতে, স্বর্গে প্রবেশ করেছে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতারিত হয়ে প্রবেশ করার পর অতি শীঘ্রই তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা আসলে জাহান্নামে, নরকে প্রবেশ করেছে। কথাটা ভালো করে বোঝার জন্য দাজ্জালের উগ্রতম রূপ সাম্যবাদ (কমিউনিজমকে) বিবেচনায় নেয়া যাক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশনে-এ কথা লক্ষ কোটি বার বলা হয়েছে যে সাম্যবাদী সমাজে, দেশে থাকা স্বর্গের সুখে থাকার সমান। যারা ঐ দেশগুলোর রেডিও মোটামুটি নিয়মিতভাবে শুনে এসেছেন তাদের এ কথা বলে দেবার দরকার নেই। এখানে লক্ষণীয় যে, তারা তাদের সমাজটাকে সর্বদাই ¯M (Paradise) বলে বাকি পৃথিবীকে সাম্যবাদ গ্রহণ করে স্বর্গে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং বিশ্বনবী ঠিক ঐ জান্নাত অর্থাৎ Paradise শব্দটাই ব্যবহার করেছেন। দাজ্জালের স্বর্গ Paradise যদি সত্যই স্বর্গ হয়ে থাকে তবে যারা সেখানে প্রবেশ করবে তারা নিশ্চয়ই আর কখনই সেখান থেকে বের হয়ে আসার চিন্াও করবে না, এ কথা তো আর মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কী হয়েছে? কমিউনিস্ট ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যকর করার কিছু পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে বাকি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে শাসকরা যেটুকু খবর বাইরে যেতে দিত তার বেশি আর কোনো খবর বাকি পৃথিবীর কেউ পেত না। এই বিচ্ছিন্নতা অতি শিগ্‌গিরই এমন পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছল যে বাকি দুনিয়ায় এর নাম হয়ে গেল Iron Curtain, লোহার পর্দা। এ পর্দা এমন দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়াল যে, বিরাট দেশটার সাধারণ সড়ক বা বিমান দুর্ঘটনার খবর পর্যন্ত বাকি দুনিয়ার মানুষ জানতে পারত না। পরবর্তীতে যখন চীন ঐ জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করল, দাজ্জালকে রব স্বীকার করে দাজ্জালের উগ্রতম পর্যায় সাম্যবাদী জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করল তখন সেখানেও সেই একই ব্যাপার দাঁড়ালো, চীন বাকি দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল এবং এর নাম হয়ে গেল Bamboo Curtain, বাঁশের পর্দা।

এই দুই বিরাট দেশের শাসকরা এই বিচ্ছিন্নতার নীতি কেন গ্রহণ করলেন? একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগের ফলে কোনো দেশ জাতি বা সমাজ যদি স্বর্গে পরিণত হয় তবে তো সেই জাতির শাসকদের ঠিক উলটো করা উচিত। পর্দা দেবার বদলে তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল mg¯ দ্বার খুলে দেয়া; বাকি পৃথিবীকে বলা যে- দেখো! আমরা বলছি আমরা স্বর্গসুখে আছি এ কথা সত্য কিনা। তাদের কর্তব্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে বলা যে, আমরা পাসপোর্ট পথা উঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এ স্বর্গ ছেড়ে যদি কোথাও যেতে চাও যাও, কোনো বাধা দেব না। তাদের কর্তব্য ছিল বাকি পৃথিবীর মানুষকে ডেকে বলা-আমরা ভিসা প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এসে দেখে যাও আমরা জান্নাতে (Paradise) আছি কিনা। পরবর্তীতে ঠিক ঐ ব্যাপার চীনেও হলো। সাম্যবাদ, কমিউনিজমের জন্মের পর থেকে এই সেদিন পর্যন্ত অর্থাৎ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত কমিউনিস্ট দেশগুলো যে নিজেদের বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তাদের জনগণের সাথে বাইরের পৃথিবীর জনগণের সামান্যতম সংযোগ ছিল না এ কথা কোনো Z_¨wfÁ (Informed) মানুষই অস্বীকার করতে পারবেন নw, GUv HwZnwmK mZ¨| H দেশগুলোর বাইরের দুনিয়ার সাথে সংযোগ ছিল শুধুমাত্র ওপরের তলার শাসকদের সঙ্গে, আর কারো সঙ্গে নয়।

শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের ব্যাপারেই নয়, যখনই যে দেশ দাজ্জালের উগ্রতম রূপ কমিউনিজমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার স্বর্গে প্রবেশ করেছে, তখনই সে দেশকে সোভিqZ I চীনের মত বাকি পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হয়েছে। 'স্বর্গে' প্রবেশ করেও ঐ উল্টো নীতি গ্রহণ করা ছাড়া ঐ সব দেশের শাসকদের আর কোনো নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তার কারণ হলো এই যে, স্বর্গের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সেই স্বর্গে প্রবেশ করার পর সেসব দেশের জনসাধারণ অতি শীঘ্রই বুঝতে পারল যে এ তো স্বর্গ নয়, এ তো নরক। কিন্তু তখন বেশি দেরী হয়ে গেছে। তবুও তারা প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে লাগল ঐ স্বর্গ থেকে বের হয়ে আসার জন্য। সহজ কথা নয়, কারণ ও স্বর্গ থেকে বের হবার অর্থ নিজেদের দেশ, লক্ষ স্মৃতি জড়ানো প্রিয় জন্মভূমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে, অচেনা সমাজে বাস করা, যাদের ভাষা পর্যন্ত তাদের অজানা। কিন্তু অনস্বীকার্য ইতিহাস এই যে, ঐসব দেশের জনসাধারণ তাদের জন্মভূমি থেকে পালিয়ে অজানা দেশে চলে যাবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

এই চেষ্টায় তারা পরিবারের অন্যদের প্রাণও বিপন্ন করেছে, সহায়-সম্পদ বিসর্জন তো ছোট K_v|

কমিউনিস্ট পূর্ব বার্লিন থেকে পশ্চিম বার্লিনে লোক পালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে রাশিয়ানরা বিখ্যাত বা কুখ্যাত বার্লিন দেয়াল তৈরি করল। তবুও মানুষ পালানো বন্ধ করা যায় না দেখে দেয়ালের ওপর প্রতি পঞ্চাশ গজ অন্তর i ¯¤ (Watch tower) তৈরি করে সেখানে মেশিনগান বসানো হলো। হুকুম দেয়া হলো কাউকে দেয়াল টপকে পালাতে দেখলেই গুলী করে হত্যা করতে। তবু লোক পালানো বন্ধ হয় না দেখে পরিখা খোড়া হলো, কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হলো ও নানা রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বসানো হলো পলায়নকারীদের খুঁজে বের করে হত্যা বা বন্দী করার জন্য। কিন্তু কিছুতেই-'স্বর্গ' থেকে পালানো বন্ধ করা গেল না। ঐ সময়ের খবরের কাগজ যারা নিয়মিত পড়েছেন, রেডিও শুনেছেন তাদের কাছে 'স্বর্গ' থেকে পালানোর চেষ্টায় গ্রেফতার, গুলী করে হত্যা ইত্যাদি দৈনন্দিন খবর ছিল। ১৯৪৯ সন থেকে ১৯৬১ সন পর্যন্ত 27 jvL bi-নারী, শিশু কমিউনিস্ট স্বর্গ থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় এবং ঐ সংখ্যার চেয়ে eû¸Y H পালাবার চেষ্টায় নিহত হয়, বন্দী হয়।

'স্বর্গ' থেকে পালানোর চেষ্টায় বহু লোক সফল হয়েছে, বহু লোক বিফল হয়েছে, বন্দী হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে। শাসকরা পালানোটা প্রায় অসম্ভব করে তোলার পর মানুষ মরিয়া হয়ে বিকল্প পথ ধরলো। একদল বেলুনে চড়ে রাশিয়ার সীমান্ত পার হলো, অনেকে নদী ও পরিখা সাঁতরে পার হলো, অবশ্য পরিখাগুলো সাঁতরে পার হতে যেয়ে অনেকে গুলী খেয়ে মারা পড়ল। দু'টি পরিবার এক অভিনব পন্থায় পূর্ব জার্মানি থেকে পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে এসে সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছিল।

পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ হয়ে পূর্ব জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন একটি কমিউনিস্ট দেশে পরিণত হওয়ার পর রেল লাইনগুলোকে নতুন সীমান্তে দেয়াল দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলে। ঐ দু'টি পরিবার অতি কৌশল ও চেষ্টায় একটি রেলওয়ে ইঞ্জিন যোগাড় করে। তারপর ঐ দুই পরিবারের নারী ও শিশুদের তাতে উঠিয়ে পুরুষরা তীব্রগতিতে ঐ ইঞ্জিনটি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে পশ্চিম জার্মানীতে চলে আসে। আরও বিভিন্ন উপায়ে বহু নারী-পুরুষ শিশু তাদের প্রিয় জন্মভূমি, দেশ, আত্মীয়-¯Rb, eÜ-বান্ধব সমস্তের মায়া ত্যাগ করে প্রাণ হাতেনিয়ে একদিন যেটাকে স্বর্গ ভেবেছিল তা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। এটা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারেই নয়, যে জনসমষ্টিই ইহুদী-vLóvb

হো চি মিন, চে গুয়েভারা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বিপ্লবীদের সফলতার পরিণাম। মার্কসীয় অর্থনীতির নিষ্পেষণের শিকার হোয়ে ভিয়েতনাম ও কিউবার নাগরিকরা এভাবেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পালায়, সাগরে ডুবে মারা যায় লাখে লাখে।

যান্ত্রিক সভ্যতার উগ্রতম রূপ কমিউনিজমের স্বর্গে প্রবেশ করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেটাকে গ্রহণ করেছে, তারা অচিরেই বুঝতে পেরেছে যে, তারা নরককে স্বর্গ মনে করে তাতে প্রবেশ করেছে।

চীনেও ঐ একই ব্যাপার হয়েছে। মোহভঙ্গের পর হাজার হাজার চীনা তাদের দেশ থেকে বাইরের জগতে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় প্রাণ হারিয়েছে, বন্দী হয়েছে। মূল চীন ভূখণ্ড থেকে সমুদ্র প্রণালী সাঁতরে পার হয়ে ব্রিটিশ শাসিত হংকং-এ পালিয়ে যাবার চেষ্টায় বহু চীনা ডুবে মারা গেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকানরা হেরে যাবার পর সম্পূর্ণ ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাবার পর সে দেশ থেকে মানুষ পালানোর যে বিরাট হিড়িক পড়ে গিয়েছিল ও তা বহু বছর পর্যন্ চলেছে সে খবর জানা নেই এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। ছোট বড় নৌকা বোঝাই করে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ মানুষ সমুদ্রে ভেসেছে। তারা কোথায় পৌঁছবে, কোন্ দেশে আশ্রয় পাবে কিছুই না জেনেও তারা শুধু দাজ্জালের 'স্বর্গ' থেকে পালাবার জন্য মরিয়া হয়ে যে নৌকায় একশ' জনের স্থান হবে সে নৌকায় পাচ সাতশ' মানুষ ভর্তি হয়ে সমুদ্রে ভেসেছে। হাজার হাজার নৌকা জোর বাতাসে, ঝড়ে ডুবে গেছে, হাজার হাজার নৌকা জলদস্যুরা (Pirates) আক্রমণ করে লুটে নিয়েছে, মানুষদের হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, তাদের বিদেশে বিক্রি করে দিয়েছে। তবু 'স্বর্গ' থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা থামে নি।

G mg¯ Lei nvRvi nvRvi evi mg¯ পৃথিবীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, বহু ছবি ওগুলোতে ছাপা হয়েছে। সেই সব লোমহর্ষক খবর পড়ে, ছবি দেখে পৃথিবীর মানুষের হৃদয় কেঁপে উঠেছে। এত সংখ্যায় এত বার এই পালানোর চেষ্টা হয়েছে যে এদের জন্য একটা আলাদা শব্দই সৃষ্টি হয়েছে-The Boat people-নৌকার মানুষ। পৃথিবীর সমস্ msev`cÎ, রেডিও, টেলিভিশন এখন এদের এই নামেই উল্লেখ করে। ভিয়েতনামেও এসব খবর পৌঁছেছে, কিন্তু তাতেও ঐ স্বর্গের অধিবাসীদের ফেরাতে পারে নি। তারপরও তারা স্ত্রী-পুরুষ, নারী ও শিশুদের দিয়ে নৌকা অতিরিক্ত বোঝাই করে প্রাণ হাতে নিয়ে অজানা সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়েছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এমন একটাও দেশ নেই যেখানে 'স্বর্গ' থেকে পলায়নকারী আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য বড় বড় শিবির (Camp) খুলতে না হয়েছে। এই সেদিন হংকং-Gi Avkq শিবির থেকে লোকজনকে ভিয়েতনামের 'স্বর্গে' ফেরত পাঠাবার চেষ্টায় আশ্রয়প্রার্থীদের সাথে হংকং পুলিশের যে তুমুল সংঘর্ষ হয়ে গেল, যাতে পুলিশসহ 'স্বর্গের' ভূতপূর্ব বাসিন্দাদের কয়েকজন মারা গেল সে সংবাদ ও ছবি আমাদের দেশের প্রায় সব সংবাদপত্রেই ছাপা হয়েছিল (এটি নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা।)। ঐ একই অবস্থা প্রতিটি সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দেশের। কমিউনিস্ট কিউবার একটি উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা এখন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অস্থায়ীভাবে বাস করছে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে।

দাজ্জালের ঘোষিত জান্নাত যে সেটার অধিবাসীদের জন্য প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমার মনে হয় কোরিয়ার যুদ্ধের একটি ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া দেশটি দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং এ ভাগ আজও আছে। দু'টোই দাজ্জালের পূজারী। শুধু তফাৎ হচ্ছে এই যে দক্ষিণ কোরিয়া দাজ্জালের পূর্বতন পর্যায়ের গণতান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে আছে আর উত্তর কোরিয়া দাজ্জালের উগ্রতর পর্যায়ের সাম্যবাদী একনায়কতান্ত্রিক অর্থাৎ কমিউনিস্ট ব্যবস্থার অধীনে আছে।

১৯৫২ সালে এই দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। উত্তর কোরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এল কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন আর দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এল জাতিসংঘের (United Nations) অধীনে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেকগুলো অ-কমিউনিস্ট দেশ। h× Pjj wZb eQi| Zvici mwÜ হলো। সন্ধির অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটি শর্ত হলো যুদ্ধবন্দী বিনিময়। এ বিনিময়ের শর্তের মধ্যে একটি শর্ত হলো এই যে, কোনো পক্ষই যুদ্ধবন্দীদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ফেরত পাঠাতে পারবে না, যারা নিজেদের ইচ্ছায় তাদের দেশে ফিরে যেতে চাইবে শুধু তাদেরই ফেরত পাঠানো যাবে। যুদ্ধবন্দী বিনিময় হয়ে যাবার পর দেখা গেল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও উত্তর কোরিয়ার অর্থাৎ কমিউনিস্টদের হাতে অ-কমিউনিস্টদের অর্থাৎ আমেরিকান ও অন্যান্য দেশের ১২,৭৬০ (বার হাজার সাতশ' ষাট) জন যুদ্ধবন্দীর মধ্যে ৩৪৭ (তিনশ' সাতচল্লিশ) জন ফিরে আসতে অস্বীকার করল, অর্থাৎ তারা কমিউনিস্ট দেশেই থেকে গেল। এদের মধ্যে ২১ (একুশ) জন আমেরিকানও ছিল।

অপরদিকে জাতিসংঘের অধীনে দেশগুলোর অর্থাৎ অ-কমিউনিস্টদের হাতে কমিউনিস্টদের ৭৫,৭৯৭ (পঁচাত্তর হাজার সাতশ' সাতানব্বই) জন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে থেকে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে অস্বীকার করল ৪৮,৮১৪ (আটচল্লিশ হাজার আটশ' চৌদ্দ) জন। এZ wecj সংখ্যক যুদ্ধবন্দী তাদের নিজ দেশে ফেরত না যাওয়ায় জাতিসংঘ এক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। পরে এদের ফিলিপাইনে, ফরমোসা ও অন্যান্য স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। যাদের মনে এই সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ বা অবিশ্বাস আসবে তারা কোরিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস, ব্রিটিশ বিশ্বজ্ঞান cKvl (Encyclopedia Britannica) দেখে নিতে পারেন বা সরাসরি জাতিসংঘে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারেন।

এই ঘটনার পর আর কোনো সন্দেহ কি থাকতে পারে যে কমিউনিস্টদের বহু ঘোষিত 'স্বর্গ' (Paradise) প্রকৃতপক্ষে সেটার অধিবাসীদের জন্য নরক? ওটা যদি নরক নাও হয়ে শুধু বাইরের দুনিয়ার অর্থাৎ A-কমিউনিস্ট দেশ ও জাতিগুলোর অবস্থার মত হতো তবে ঐ হাজার হাজার যুদ্ধবন্দীরা সকলেই অবশ্যই তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যেত। কারণ উভয় স্থানের অবস্থা সমান বা মোটামুটি সমান হলেও একদিকের পাল্লায় রয়েছে তাদের প্রিয় দেশ, জন্মভূমি, evev-gv, fvB-বোন, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে, বন্ধু-বান্ধব, শৈশবের স্মৃতি জড়ানো বাসস্থান। ঐ সমস্ বিসর্জন দিয়ে যদি হাজার হাজার মানুষ অজানা দেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকির সিদ্ধান্ নেয়, তাহলে নিশ্চিতই বলা যায় যে, ঐ লোকগুলো তাদের দেশকে জাহান্নাম বা নরক বলে বিশ্বাস করে। ফেরত না যাওয়া ঐ সংখ্যা থেকেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যে ২৬,৯৮৩ (প্রায় mvZvk হাজার) যুদ্ধবন্দী নিজেদের কমিউনিস্ট দেশে ফিরে গেল তারা ফিরে গেছে দাজ্জালের স্বর্গের জন্য নয়, গেছে তাদের স্ত্রী, পুত্র-Kb¨v, evc-gv°i, eÜ-বান্ধবের, আত্মার সাথে জড়ানো, মায়া মমতায় ঘেরা জন্মভূমিকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে না পেরে। ঐগুলোর মায়া ত্যাগ করতে না পেরে তারা জেনে-শুনেই নরকই বেছে নিয়েছে। সন্ধির শর্তের মধ্যে যদি এই শর্তও যোগ করা হতো যে, যেসব যুদ্ধবন্দী স্বেচ্ছায় নিজেদের দেশে ফিরে যাবে না তাদের পরিবারকেও এনে তাদের কাছে দেয়া হবে তবে এ সাতাশ হাজারের মধ্যে সাতশ' জনও ফিরে যেত কিনা সন্দেহ আছে।

এখন প্রশ্ন হলো-এ কী রকম 'স্বর্গ' যে স্বর্গের অধিবাসীরা সেখান থেকে পালানোর জন্য প্রাণ হাতে নেয়, সমুদ্র সাঁতরে পার হবার চেষ্টায় ডুবে মরে, ছোট ছোট নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টা করে, ইলেকট্রিক কাঁটা তারের শক্ খেয়ে মরে, 'স্বর্গরক্ষীদের' গুলী খেয়ে মরে এবং শত্রুর হাতে বন্দী হলে জন্মভূমি, স্ত্রী-পুত্রের মায়া ত্যাগ করে আবার 'স্বর্গে' ফিরে যেতে অস্বীকার করে! এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসে। সেটা হলো-তবে কি যেসব দেশ কমিউনিজম গ্রহণ করেছে শুধু সেইসব দেশ জাহান্নামের মত, আর যে সব দেশ করে নি সেগুলো জান্নাতের মত? না, তা নয়। আমি পেছনে বলে এসেছি যে- RvZxq, ivóxq, mvgwiK, Av_-সামাজিক ইত্যাদি কোনো বিষয়েই খ্রিষ্টান ধর্মের কোনো নির্দেশনা, এমনকি বক্তব্য পর্যন্ না থাকা সত্ত্বেও ওটাকে সামগ্রিক জীবনে প্রয়োগের চেষ্টায় অবধারিত ব্যর্থতা যখন ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম দিলো, স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে এল তখনই দাজ্জালের জন্ম হলো।

তারপর জন্মের পর যেমন কোনো প্রাণী ক্রমে বড় হয়, তার জীবনে GKUvi ci GKUv avc ev পর্ব আসে, তেমনি দাজ্জালের জীবনেও ধাপ, পর্ব (Phase) এসেছে। প্রথমে গণতন্ত্র ও তার অপূর্ণতা ও ত্রুটির কারণে উদয় হয়েছে একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)। ধনতন্ত্রের কুফল ও অবিচারের ফলে এসেছে সমাজতন্ত্র ও তার উগ্রতর রূপ সাম্যবাদ, কমিউনিজম। সময়ে সময়ে ঐ বিভিন্ন পর্যায়ের, ধাপের অনুসারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র জোট বেঁধে একনায়কতন্ত্রকে ধ্বংস করল। কিন্তু তার পরপরই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই (Cold war) শুরু হয়ে গেল। এই ঠাণ্ডা লড়াই কোরিয়ায়, ভিয়েতনাম ও আরও ছোট খাটো দু'চার জায়াগায় প্রকৃত যুদ্ধের (Shooting war) রূপ নিলেও ব্যাপক আকারে হয় নি শুধু একটি মাত্র কারণে। সেটা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের ও সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের উভয়ের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র ছিল। উভয়েই জানত যে এ অস্ত্র ব্যবহার করলে উভয়কেই ধ্বংস হতে হবে। এই পরিস্থিতিই Deterent হিসেবে কাজ করে তখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধতে দেয় নি। নিজেদের পরিণামের এই ভয়ই শুধু পৃথিবী ধ্বংসকারী অস্ত্রগুলোকে ব্যবহার করা থেকে উভয়পক্ষকে বিরত রেখেছে। যান্ত্রিক 'সভ্য' ভাষায় এরই নাম Deterent, দা'তাত। কিন্তু মনে রাখতে হবে দাজ্জালের জীবনে শৈশব, কৈশোর, যৌবনের মত পর্যায় আসলেও এবং কখনো কখনো ঐ পর্যায়গুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হলেও দাজ্জাল একটিই, মহাশক্তিধর আত্মাহীন দানব Bû`x-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা, ওঁফবড়-Christian Meterialistic Civilization|

কাজেই কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়ার যেসব যুদ্ধবন্দী দেশে ফিরে গেল না তারা শুধু দাজ্জালের স্বর্গের উগ্রতম অবস্থা থেকে কিছু নম্রতর অবস্থায় ফিরে এল মাত্র। কোরিয়ার যুদ্ধোত্তর বন্দী বিনিময় অংকের হিসাব প্রমাণ করে দিয়েছে মহানবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যেটায় তিনি বলছেন-দাজ্জালের সঙ্গে একটি জান্নাতের মত আরেকটি জাহান্নামের মত জিনিস থাকবে। সে মানবজাতিকে আহ্বান করে বলবে-আমাকে তোমরা রব (প্রভু) বলে মেনে নাও (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করে আমার সার্বভৌমত্ব মেনে নাও)। যারা তাকে রব বলে মেনে নেবে (ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি গ্রহণ করবে) সে তাদের তার জান্নাতে স্থান দেবে এবং সেটা তাদের জন্য জাহান্নাম হবে, আর যারা তাকে রব বলে স্বীকার করবে না সে তাদের Zvi জাহান্নামে দেবে এবং সেটাই তাদের জন্য জান্নাত হবে।

ধর্মব্যবসায়ীদের কূপমণ্ডুকতায় ব্যর্থ হল লেনিনের পরিকল্পনা

সারা দুনিয়ায় কিছুদিন আগে বাম আদর্শের জয়জয়কার ছিল, এখনও বাম আন্দোলন টিকে আছে তাত্ত্বিকভাবে, বহু মানুষের মুখে বামপন্থীদের নাম সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনো উচ্চারিত হয়। পুরো রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, ভারত উপমহাদেশের বুদ্ধিজীবী gnj, wkíx, mwnwZ¨K, ivRbxwZK, wk¶K-ছাত্রদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ বাম ঘরানার।

আমরা বাম আদর্শের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারি তা হচ্ছে, ইংল্যান্ডে যখন প্রথম রাষ্ট্রীয়জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা আরম্ভ হলো তখন থেকেই মানুষ জাতীয় চরিত্রে চরম বৈষয়িক ও বস্তুবাদী হয়ে পড়তে আরম্ভ করল। তখন অর্থনxwZ wQj m`wfwËK cwRev` Ges শাসনতন্ত্র ছিল সামন্তবাদ। সুদী অর্থনীতির ফলে সমাজের কেউ হয়ে গেল অকল্পনীয় অর্থ-বিত্তের মালিক আর কেউ হয়ে গেল দারিদ্র্যের নির্মম শিকার। শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়ায় খনিজ সম্পদসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কাঁচামাল থেকে ব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদনকারী যে বিপুল সংখ্যক কারখানা সৃষ্টি হলো, প্রায় কোটি কোটি মানুষকে একরকম বাধ্য করা হলো সামান্য মজুরিতে সেই কারখানাগুলোতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য। সামন্তবাদী রাষ্ট্রগুলোতে এই শ্রমিকবর্গসহ নিম্ন শ্রেণির মানুষগুলোর শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থা রইল না, তারা মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হলো। আজকের সংশোধিত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি দাওয়া ও আন্দোলনের কারণে, শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষোভের ভয়ে কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু আজ থেকে ১০০ বছর আগেও এই গণতন্ত্রের সমাজব্যবস্থায় শ্রেণিহীন মানুষের দুর্গতির কথা পড়লে চোখের পানি ধরে রাখতে কষ্ট হয়। এই অবস্থার কারণে ইউরোপের জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, কী করে এই মানুষগুলোকে মুক্তি দেয়া যায়? সেই জ্ঞানী-গুণী, মুক্তচিন্তার মানুষগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলেন কার্ল মার্কস, লেনিন এরা। তারা চেষ্টা করলেন মানুষকে অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তি দেবার জন্য। যতটুকু বোঝা যায় তাদের অভিপ্রায় ভালোই ছিল। তখন তারা চিন্তা করে দেখলেন যে, ধর্মের মধ্যে সমাধান খুঁজে লাভ নেই, সেগুলো মানুষকে বুঁদ করে ফেলে, সেগুলো মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে অক্ষম।

ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পাশবিক পীড়নের পর বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মানবজাতির সামনে আশার বাতি নিয়ে হাজির হয়েছিল সমাজতন্ত্র নামক মতবাদ। পতঙ্গ যেমন অন্ধ মোহে আগুনের শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি সারা পৃথিবীর তরুণ যুবক সমাজতন্ত্রের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। মানুষের ভিতরে বিপ্লবের যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত থাকে সেটা জাগিয়ে তুলেছিল সমাজতান্ত্রিক পুরোধারা। কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পতঙ্গের যা পরিণতি হয়, অর্থাৎ মৃত্যু; সমাজতন্ত্রের বেলাতেও সেটাই ঘোটেছে। চাকচিক্যময় মাকাল ফল সদৃশ এই মার্কসীয় মতবাদের অভ্যন্তরে যে বিষময় কদর্যতা লুকিয়ে আছে তার প্রকাশ ঘটতে ৭৫ বছরের অধিক সময় পার হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর যে কয়টি স্থানেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেখানেই সৃষ্টি হয়েছিল চূড়ান্ত ভারসাম্যহীনতা, শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, পদদলিত হয়েছিল মানবতা। মানুষের আত্মা ত্রাহিস্বরে চিৎকার করে উঠেছিল কেবল মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা নিয়ে। অথচ এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মার্কস লেনিন প্রমুখ তাত্ত্বিকরা আখ্যা দিয়েছিলেন 'স্বর্গরাজ্য'।

কমিউনিস্টদের এই নিদারুণ ব্যর্থতার কারণ আগেই বলেছি যে মানুষ কেবল দেহ নয়, তার আত্মাও আছে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন কার্ল মার্কসের তত্ত্বের বাস্তব রূপকার ভ.ই.লেনিন কিন্তু এর কোনো সমাধান করে যেতে পারেন নি দু'টি কারণে। প্রথমত ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র, এবং wØZxয়ত বিকৃত ইসলামের ধারক-বাহক কূপমণ্ডূক মোল্লাদের ইসলাম-পরিপন্থী ফতোয়াবাজি।

সমাজতন্ত্রীরা নিজেদেরকে প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তার ধ্বজাধারী মনে করেন এবং পক্ষান্তরে ইসলামসহ সকল ধর্মমতকে একচেটিয়াভাবে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেন, সকল ধর্মকে স্থবির, কল্পকাহিনী, জড়তা, কূপমণ্ডূকতা বলে গালিগালাজ করেন, বিশেষ করে মুসলিমদেরকে পশ্চাৎপদ, গোঁড়া, মধ্যযুগীয়, অন্ধ বলেন। এটা বলেন কেন? এটা বলার কারণ, তারা মসজিদে, মাদ্রাসা, খানকার চার দেয়ালের ভেতরে দাড়িওয়ালা-টুপিওয়ালা, লম্বা পাগড়ীওয়ালা লেবাসধারী মওলানা ও পীর সাহেবদেরকে দেখে মনে করেন এটাই বুঝি ইসলাম। কিন্তু না, এটা প্রকৃত ইসলাম নয়। প্রকৃত ইসলামের অনুসারীরা কখনও স্থবির হতে পারেন না, প্রকৃত ইসলামের চেয়ে বিস্ফোরণমুখী, গতিশীল, বৈপ্লবিক আর কিছু হতে পারে না। তারা কখনও কূপমণ্ডূক নয়, তাদের সংস্কৃতি রুদ্ধ নয়, দুনিয়াজোড়া তাদের দৃষ্টি। তারা নির্দিষ্ট কোনো পোশাকী গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না, কারণ যে জীবনব্যবস্থা এসেছে সারা পৃথিবীর সব ভৌগোলিক পরিবেশের মানুষের জন্য, সেই জীবনব্যবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট পোশাক থাকতে পারে না; ঠিক যে কারণে গণতন্ত্রে বা সমাজতন্ত্রের কোনো নির্দিষ্ট পোশাক নেই। গত ১৩০০ বছরে প্রকৃত ইসলাম সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশরা ষড়যন্ত্র করে তাদের সকল উপনিবেশগুলোতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে একেবারে চূড়ান্ত একটা বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দিয়ে মুসলিম জাতিকে একেবারে বিপরীত দিকে পরিচালিত করছে। এই ইসলাম যে কতটা বিকৃত তার একটি প্রমাণ লেনিনের জীবন থেকে দেওয়া যায়। ঘটনাটি আমরা উদ্ধৃত করছি মাওলানা kvgm bvex` Dmgvbx iwPZ Now of Never গ্রন্থ থেকে যা অনুবাদ করেছেন স.স.আলম kvn| Abev` c¯ক 'বেদ-কুর'আন ও স্বজাতির বিভেদ'। আরও দেখুন উর্দু পত্রিকা 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' এর ২৮তম সংখ্যা, ১৯৮২, সূত্রঃ জগদগুরু মুহাম্মদ (সা.), রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স। পৃষ্ঠা-209-২১০। ঘটনাটি হলোঃ

রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লবের মহানায়ক কমরেড লেনিন বিশ্বধর্মের পর্যালোচনা করার পর ইসলামে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি রুশীয় জনগণের ইসলাম গ্রহণের আশা পোষণ করতেন। কথিত আছে যে, জনৈক বাকরা খাঁন নামক বুযুর্গের সংস্পর্শে আসার পর তিনি ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হন। তার দ্বারা লেনিন যথেষ্ট প্রভাবিত হন। যাই হোক, লেনিন সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু মিশরীয় উলামাদের অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের ষড়যন্ত্রের ফলে এই সুযোগ হাতছাড়া হয়।

iwkqvi Rvi-তন্ত্রের পতনের পর লেনিন হন সর্বময়কর্তা। তিনি কমিউনিস্ট প্রশাসন স্থাপন করেন। একদিন তিনি নিকটতম বন্ধুবর্গের বৈঠক ডাকেন। তাতে তিনি বলেন, 'আমরা সরকার গঠনে সফল হয়েছি কিন্তু একে সুদৃঢ়, সুবিন্যাস্ত, শাশ্বত ও সার্বজনীন করে তোলার জন্য আমাদেরকে এমন এক জীবনব্যবস্থা দিতে হবে যা হবে মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের শুধুমাত্র অন্নবস্ত্রই যথেষ্ট নয়। আত্মার খোরাকও প্রয়োজন। ক্ষুধার্ত মানুষকে রুটি দিয়ে শান্ত রাখা যায় একটা পর্যায় পর্যন্ত। এ পর্যায় অতিক্রান্ত হলে মানবাত্মা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠে। এ তৃষ্ণা নিবারণের কোনো উপকরণ-ই আমাদের কাছে নেই। আছে ধর্মাচারের মাধ্যে। আমি পৃথিবীর সব ধর্ম-ই গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি, সবখানে পেয়েছি আফিমের আবেশ। শুধুমাত্র

একটি ধর্মকেই পেয়েছি প্রাণবন্ত জীবনব্যবস্থা হিসেবে। এক অনিরুদ্ধ গতিময়তা এর মধ্যে বিদ্যমান। এটাই আমাদের প্রগতিশীল জীবন ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহায়ক বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এখন সে ধর্মের নাম আমি শুধু বলব। এ ব্যাপারে মত প্রতিষ্ঠায় আপনারা তাড়াহুড়ো করবেন না। কেননা প্রশ্নটি কমিউনিজমের জীবন মত্যুর সঙ্গে জড়িত (Don't hasten to form your own conclusions because this question pertains to the life and death of Communism.) আপনারা সময় নিয়ে ভাবনা চিন্তা কোরুন। হতে পারে আমার ধারণা ভুল, কিন্তু আমাদের আত্মপ্রশান্তি Rb¨ VvÊv gv_vq চিন্তা করতে হবে। আমি মনে করি যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রের নিকটতম (Islam is the only religion closer to the economic programmes of Communism.)

এ কথা শুনে সমবেত লোকদের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে যায়। তখন লেনিন তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন- আজ থেকে পুরো এক বছর পরে পুনরায় আমরা একত্রিত হব। আর তখনই আমরা ঠিক করব কমিউনিস্টদের ধর্মাশ্রয়ী হওয়া উচিত হবে কি না, যদি গ্রহণ করতেই হয় তাহলে সে ধর্ম কোনটি?"

ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর এ সংবাদ অবহিত হয়ে এটাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের অশনি সংকেত মনে করল। তারা ভাবলো, যদি উদীয়মান শক্তি কমিউনিস্ট রাশিয়া এবং বিপন্ন বিপর্যস্ত আধমরা লড়াকু মুসলিম জনগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে ওপনিবেশিক ব্রিটিশদের বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠবে। সুতরাং ব্রিটিশ কূটনৈতিকরা তৎপর হয়ে উঠল বিশ্বব্যাপী। মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হল এমন এক সংবেদনশীল প্রশ্ন যে কমিউনিজম হলো আল্লাহবিরোax gZev`| ইসলামের জন্য আল্লাহদ্রোহী এই মার্কসীয় মতবাদ কি গ্রহণীয় হতে পারে? ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে মুসলিম বিশ্বের আলেম ওলামার নিকট থেকে ফতোয়া নেয়া হল। একইভাবে এ প্রশ্নে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ আলেমদের দৃষ্টি AvKlY Kiv nj। আলেমগণ এ সংক্রান্ত প্রশ্নের পটভূমি ও এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অবগত ছিলেন না। ফলে আল-আযহারের ওলামাগণ এরূপ নেতিবাচক বিধান প্রকাশ করলেন যা ব্রিটিশ প্রশাসন একান্তভাবে চাইছিল। অতঃপর যা হবার তাই হলো। ব্রিটিশ সরকার এ ফতোয়া ছাপিয়ে সারা বিশ্বে বিলি করল। এখন পর্যন্ত iwkqvi gmলিম অধ্যুষিত অনেক এলাকায় মুসলিমদের অনেকের কাছে এ ফতোয়ার কপি রয়েছে। এ সংবাদ লেনিনও অবগত হলেন। এতে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বলেন- 'আমার ধারণা ছিল মুসলিমরা কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। কিন্তু ev¯বে তারা প্রমাণ করল, অন্য আর সব ধর্মাবলম্বীদের মতো মুসলিমরাও গোঁড়া, তত্ত্বসব¯ I সংকীর্ণ।' ফলশ্রুতিতে পরিকল্পনা অপূর্ণ থেকে গেল আর লেনিন বিরোধীরা স্বস্তি wbtkvm ফেলল।

সেদিন লেলিনের এই প্রস্তাব আলেমরা নিতে পারেন নি। কারণ, তখন মদীনা, কায়রো, লাহোর, দিল্লী, কলকাতা ইত্যাদি জায়গায় যে ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ব্রিটিশ পণ্ডিতদের তৈরি করা

সিলেবাস মোতাবেক যে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হোচ্ছিল (এবং এখনও হচ্ছে) সেটি আদৌ Avjvn-রসুলের ইসলাম নয়। সেই ফতোয়া দানকারী ধর্মব্যবসায়ীরা ছিল কূপমণ্ডূক মোল্লা যারা প্রকৃত ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন। স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান করে তারা ব্রিটিশ বেনিয়াদের তৈরি মতবাদ ও সার্বভৌমত্ব তারা মেনে নিয়েছে। আজও পৃথিবীময় ধর্মব্যবসায়ীদের পণ্যরূপী সেই অন্তঃসারশূন্য, স্থবির ইসলামকেই আপনারা দেখছেন এবং অনর্থক আল্লাহ-রসুলের প্রতি বিদ্বেষ লালন ও বিস্তার করে যাচ্ছেন।

সেদিন মুক্তমনা মানুষ লেনিনের পুরো রাশিয়ার জনগোষ্ঠীর জাতীয় জীবনে ইসলামকে সহায়ক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণকে যে ধর্মব্যবসায়ীরা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাদের মনোভাব ছিল অনেকটা এমন- ঐ ব্যাটা তো নাস্কি, কাফের। ওকে ইসলাম ধর্মের বিধান ব্যবহার করতে দিলে তো ইসলামের জাত যাবে। আজও একই ধারণা ধর্মজীবীরা পোষণ করেন। তাদের জানা দরকার আল্লাহর রসুলের সময় রসুল যখন প্রকৃত ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছিলেন তখন তাঁর আহ্বানে ইহুদি, খ্রিষ্টান, নাস্কি, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক সব জাতির মানুষ ইসলামের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এমন কি রসুলাল্লাহ খ্রিষ্টান শাসক নাজ্জাশির মৃত্যুর পর সাহাবিদেরকে বলেছিলেন যে, তোমাদের একজন ভাই মৃত্যুবরণ করেছেন। রসুলাল্লাহ নিজে Zvi জানাজার সালাহ কায়েম করিয়েছিলেন। কারণ নাজ্জাশি রসুলাল্লাহর আসহাবদেরকে অকপটে সহযোগিতা করেছিলেন। যদি মাননীয় এমামুয্যামানের সঙ্গে কমরেড লেনিনের সাক্ষাৎ হতো, আমাদের বিশ্বাস রাশিয়াতে কমিউনিজমের যাঁতাকলে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত হওয়ার যে দুর্বিসহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা হওয়া সম্ভব হতো তা। রাশিয়ার ইতিহাস হতো Ab¨|

1990-তে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় মার্কসবাদীদের তীর্থভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়, তারপরই সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় আস্তাকুঁড়ে। সে সময়ের গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকরা আজও দুর্বল কণ্ঠে সমাজতন্ত্রের জয়োগান করেন কিন্তু বাস্তবে তারা সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস লেলিনের আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং বর্তমানে তারা চরম পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসারী। তাদের অধিকাংশই নিজেরা পুঁজিপতি হয়ে বসেছেন, স্বার্থের রাজনীতি করছেন, শ্রেণিহীন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নিজেদের ভাগ্য cwiবর্তনে সচেষ্ট হয়েছেন। সকল ধর্মের পুরোহিতরা যেমন ধর্মকে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন তারাও এখন মার্কস, লেনিন, অ্যাঙ্গেলসকে বিক্রি করছেন। তারাও মানুষকে শান্তির স্বপ্ন দেখিয়ে প্রতারণা করে যাচ্ছেন। তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, সমাজতন্ত্র আর বিকোবে না, এখন গণতন্ত্রের হাওয়াটা জোরালো, তাই সেদিকেই এখন ছাতা ধরে আছেন। ফলে তাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবন ঋষ্টপুষ্ট হচ্ছে।

যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাদের প্রতি আমাদের শেষ কথা হলো, যদি তারা সত্যিই মানুষের কল্যাণ চান, তবে তাদের উচিত প্রকৃত ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যা দুর্দান্ত cMwZkxj এক জীবনব্যবস্থা। সেটা মোল্লাদের কাছে নেই, সেটা আল্লাহ দয়া করে হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। সেটা প্রতিষ্ঠিত হলে পৃথিবীতে থাকবে না ধর্ম-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ, শ্রেণিবৈষম্য,

পুরো মানবজাতি হবে এক জাতি। মানব সমাজে এমন অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যে, প্রত্যেকের নিজের মেধা ও পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থের উপর যেমন পূর্ণ অধিকার থাকবে, অপরপক্ষে সমাজের প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হয়ে যাবে, মানুষ তো দূরের কথা একটি কুকুরও বুভুক্ষ থাকবে না। ধনীর সম্পদে দরিদ্রের ন্যায্য অংশীদারত্ব থাকবে। শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তার হাতে মজুরি অর্পিত হবে। মালিক ও শ্রমিক এক টেবিলে বসে খাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স লাগবে না, মিথ্যা না বলে যত খুশি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা যাবে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের আঞ্চলিক সংস্কৃতি অপরিবর্তিত থাকবে, সঙ্গীত, নাট্য, চিত্রকলায় কোনোরূপ বাধা আরোপ করা হবে না, কেবল মাত্র যা কিছু মানুষের ক্ষতির কারণ হয় সেগুলি বর্জনীয় বলে বিবেচিত হবে। আমরা বলি না যে, আপনারা আল্লাহ বিশ্বাসী হয়ে যান, মো'মেন হয়ে যান, পরকালে বিশ্বাসী হয়ে যান। আল্লাহর প্রতি কে ঈমান আনবে কে আনবে না সেটা তারা আল্লাহর সঙ্গে বুঝবে। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করানো আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ আল্লাহর শেষ রসুলের আনীত আকাশের মতো উদার, সমুদ্রের মতো বিশাল, দুর্দান্ত গতিশীল ইসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে মানবজাতিকে শান্তিgq, wbivc`, b¨vq I সুবিচারে পূর্ণ একটি জীবন উপহার দেওয়া। দল, মত, পথ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, আস্তিK, bw¯K নির্বিশেষে সকল মনুষ্য সন্তানের প্রতি আমাদের একটিই প্রশ্ন, আপনি মানবজাতির সার্বিক জীবনে সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও ন্যায় চান কি না? যদি চান, তবে সুসংবাদ গ্রহণ করুন: পথ পাওয়া গেছে।

উদ্দেশ্যচ্যুত সমাজতন্ত্রী ও উদ্দেশ্যচ্যুত উম্মতে মোহাম্মদী

উদ্দেশ্য যদি ভুল হয় তাহলে কোন কিছুরই আর দাম থাকে না। ধরুন, ১০ জন লোক একটা উদ্দেশ্য নিয়ে রওয়ানা হলো, অর্ধেক পথ গিয়ে যদি ১০ জনের উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কী হবে, একেকজন একেক কাজ করতে থাকবে, শেষ গন্তব্যস্থলে কেউই যেতে পারবে না। কাজেই ইসলামে এই জন্য সকল পণ্ডিতগণ একমত যে আকিদা ভুল হলে ঈমানের কোন দাম নেই। এই আকিদাই হলো (Comprehensive concept) mvgwMK avi Yv|
পৃথিবীতে উদ্দেশ্যহীন বা আকিদাহীন কোন কিছুই নেই। যা কিছু আকিদাহীন তাই অর্থহীন। সুতরাং কোন জাতি, গোষ্ঠী, দল বা আন্দোলনও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না।
আজ যদি কোন কমিউনিস্টকে প্রশ্ন করা যায় যে, তোমরা পৃথিবীময় সংগ্রাম করছ, বহু কোরবানি করেছ, কমিউনিজমকে পৃথিবীতে পতিষ্ঠা করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করছ, এসব কেন করছ? ঐ কমিউনিস্ট অবশ্যই জবাব দেবেন যে, পৃথিবীতে যে সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে সেটার পরিণাম হচ্ছে অর্থনৈতিক অবিচার, শোষণ, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। কাজেই সেটাকে ভেঙ্গে সেখানে কমিউনিজম চালু করলে সম্পদ সুষ্ঠু বন্টন হবে, মানুষ খেয়ে পরে বাঁচবে এবং মানুষের ঐ কল্যাণের জন্য পৃথিবীময় কমিউনিস্টরা নিজেদের সব কিছু উৎসর্গ করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন- অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের জন্য তারা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।

ঠিক ঐ কারণেই অর্থাৎ মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য বিশ্বনবীর (দ.) সৃষ্ট জাতি পার্থিব সব wKQ Z¨vg করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। শুধু তফাৎ এই যে, কমিউনিস্টরা যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সংগ্রাম করছে তা মানুষের তৈরি যা শান্তি, ইসলাম আনতে পারবে না, আরও অশান্তি সৃষ্টি হবে। তার বাস্তব প্রমাণ আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। কমিউনিজমের পতন হয়ে গেছে প্রায় দুই যুগ হতে চলল।

Avi wekনবীর (দ.) জাতি, উম্মাহ যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সংগ্রাম করেছিলেন সে ব্যবস্থা হলো স্বয়ং স্রষ্টার তৈরী ব্যবস্থা, দ্বিতীয় তফাৎ হলো মানুষের তৈরী বলে কমিউনিজম মানুষের শুধু অর্থনৈতিক মুক্তির একটা ব্যবস্থা তৈরী করেছে। মানুষের জীবনের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে ওটার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু মানুষ শুধু দেহ নয় আত্মাও, শুধু জড় নয় আধ্যাত্মিকও। পক্ষান্তরে আল্লাহ যে জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন তা মানুষের দেহের ও আত্মার প্রয়োজনের নিখুঁত সংমিশ্রণ। আল্লাহ বলেন, 'এমনইভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী বা ভারসাম্যযুক্ত জাতি হিসাবে সৃষ্টি করেছি (সুরা বাকারা ১৪৩)। এখানে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন ওয়াসাতা যার অর্থ fvimvg¨h³ (Balanced), মধ্যপন্থী। এই ভারসাম্যযুক্ত জীবনব্যবস্থাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে মানব জাতির মধ্যে শান্তি, ইসলাম আনয়ন করাই হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য, যে জন্য আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবীকে (দ.) পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যে কাজ এক জীবনে সমাপ্ত করা অসম্ভব, সে কাজের ভিত্তি তিনি স্থাপন করলেন সর্বাত্মক ও বহুমুখী সংগ্রামের মাধ্যমে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে এই শেষ জীবন বিধানের অধীনে এনে। এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ তার জীবিত কালের সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্ট জাতিকে হাতে কলমে শিখিয়ে গেলেন ইসলামের উদ্দেশ্য (mg¯ পৃথিবীতে এই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করে মানব জাতির মধ্যে শান্তি, ইসলাম, স্থাপন করা) ও প্রক্রিয়া (সালাত, সওম, হজ্ব , যাকাত ইত্যাদি)। এবং তার সৃষ্ট জাতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি কোরিয়ে গেলেন যে তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব তার (দ.) পরে তাদের উপর সম্পূর্ণভাবে অর্পিত হবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে না তারা আর তার জাতিভুক্ত থাকবে না।

আজকে সারা পৃথিবীতে ১৬০ কোটি মানুষ আছে যারা নিজেদেরকে উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন কিন্তু তারা জানেন না উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে কী তাদের দায়িত্ব। তাদের বিশ্বাস নামায রোজা করাই তাদের একমাত্র কাজ। আরও ভালো উম্মতে মোহাম্মদী হতে bামায রোযা ইত্যাদি উপাসনাগুলিই আরও বেশি বেশি করতে হবে। তারা ভুলেই গেছেন তাদের সৃষ্টিই হয়েছে আল্লাহর দেওয়া সত্য জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে। তা না করে এই জাতি পশ্চিমা বস্তুবাদী 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালের দেওয়া বিভিন্ন মতবাদ, জীবনব্যবস্থা যেমন গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি মেনে নিয়ে আর নামায রোযা করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। তারা জানেনও না যে তারা আর রসুলের জাতিভুক্ত নেই, মো'মেন মুসলিমও নেই। আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা কেবল কাফের মোশরেক এবং অভিশপ্ত অর্থাৎ মালাউন।

কার্লমার্কস, কমিউনিজম বলে একটি জীবনব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন। GUvI GKUv `xb Ges অবশ্যই এই আশা নিয়ে যে তার অনুসারীরা একে সমস্ত পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করবে এবং তা

করতে সর্বরকম সংগ্রাম করবে। তার অনুসারীরা তা করেছেও। অর্থনৈতিক অবিচার, অন্যায়কে শেষ করে সুবিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা অসীম ত্যাগ, সাধনা, সংগ্রাম, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর এক বিরাট অংশে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ বা ভবিষ্যতে যদি কমিউনিস্টরা তাদের উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে কার্ল মার্কসের ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলিকে অনুকরণ করতে থাকে তবে মার্কস কি তাদের অনুসারী কমিউনিস্ট স্বীকার করবেন? এই প্রশ্নটাই করেছিলাম একজন উৎসর্গকৃত প্রাণ যুবক কমিউনিস্ট কর্মীকে। বলেছিলাম 'আচ্ছা বলতো! ভবিষ্যতে কখনো মার্কস কবর থেকে উঠে এসে যদি দেখেন যে, তোমরা কমিউনিজমকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করেছে। শুধু তাই নয়, যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেই পুঁজিবাদকে তোমরা গ্রহণ করেছ, তোমাদের সংবিধান বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনে পাশ্চত্যের ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছ, কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তোমরা কমিউনিজম বিশ্বাসী, তোমরা মার্কসের মতো চুল দাড়ি রাখ, তার মতো হ্যাট পরো, তার মতো কাপড় পরো, মার্কস যে কাতে ঘুমাতেন তোমরাও সেই কাতে শোও, যেভাবে দাঁত মাজতেন সেইভাবে মাজ, হাতে কাস্তে nvZox gvর্কা ব্যাজ পরো, সুর করে দ্যাস ক্যাপিটাল পড় এবং কে কত সুন্দর সুর করে তা পড়তে পারে তার প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার দাও এবং এসব করে সত্যি বিশ্বাস কর যে তোমরা অতি উৎকৃষ্ট কমিউনিস্ট এবং মার্কসের বিশ্বস্থ অনুসারী- তবে মার্কস কি করবেন? কমিউনিস্ট কর্মীটি অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, তা কী করে সম্ভব? আমাদের কমিউনিস্ট বলেই স্বীকার করবেন না। আমরা যদি পুঁজিবাদী গণতন্ত্রই গ্রহণ করি তবে আমরা আর কমিউনিস্ট রইলাম কি করে? বললাম, ধরে নাও না তাই করলে, করলে মার্কস কি করবেন? একটু চিন্তা করে সে বললো, আমাদের কমিউনিস্ট বলেই স্বীকার করবেন না| 'আমাদের গায়ে থুথু দেবেন'। অনুরূপ অবস্থায় মহানবী (দ.) কি করবেন তা আমাদের কষ্ট করে অনুমান করতে হবে না। কারণ সে কথা তিনি (দ.) আমাদের আগেই বলে দিয়েছেন। হাশরের দিন আল্লাহর রসুল (দ.) সবার আগে হাউসে কাওসারে পৌঁছে যাবেন, তারপর তার উম্মতের মানুষ তার সামনে দিয়ে যেতে থাকবে আর তিনি (দ.) তাদের কাওসারের পানি পান করাতে থাকবেন, যে পানি পান করলে মানুষ আর কখনও তৃষ্ণার্ত হয় না। এর মধ্যে এমন একদল মানুষ আসবে যারা কাওসারের পানি পান করতে অগ্রসর হলেও রসুলাল্লাহ (দ.) ও তাদের মধ্যে এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে। তখন তিনি বলবেন, এরাতো আমার লোক অর্থাৎ আমার উম্মত। তখন বলা হবে অর্থাৎ আল্লাহ বলবেন, আপনি জানেন না আপনার পর আপনার উম্মাহর ঐসব লোক আপনি যে দীন রেখে এসেছিলেন তার মধ্যে কি কি বেদা'ত করেছে। এই কথা শুনে ব্যাপারটা বুঝে বিশ্বনবী (দ.) ঐ সমস্ত লোকদের বলবেন, দূর হও! দূর হও! যারা আমার পর `ীনে বেদা'ত করেছ। আল্লাহ রসুলের (দ.) মাধ্যমে যে দীন, জীবনব্যবস্থা মানব জাতিকে দিয়েছেন তা পরিপূর্ণ, তাতে কোন কিছু নতুন সংযোজন হলো বেদা'ত। এই বেদা'তকে, সংযোজনকে মহানবী (দ.) শেরক বলেছেন, কারণ এটা করা মানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা, এবং প্রকারান্তরে বলা যে আল্লাহর দীন পূর্ণ নয়। শুধু নতুন সংযোজনই যদি শেরক হয়, যে শেরক আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছেন মাফ করবেন না বলে, তবে শুধু সংযোজন নয়, দীনের সর্বপ্রধান অর্থাৎ জাতীয় ভাগটিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-Kvbb, `Êewa ইত্যাদি বর্জন করে সেখানে পাশ্চাত্যের মানুষের তৈরী ব্যবস্থা জীবনে প্রয়োগ করে রসুলের (দ.)

ব্যক্তিগত সুন্নাহগুলি পালন করে যারা নিজেদের উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনে করে আত্মপ্রবঞ্চনায় ডুবে আছেন তাদের কী অবস্থা হবে?

আল্লাহ যখন নবীকে (দ.) বেদা'তকারীদের পানি পান করাতে বাধা দেবেন তখন বোঝা গেল তারা আর নবীর (দ.) উম্মত নয়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তারা অবশ্যই তার উম্মত ছিলো, নইলে মহানবী (দ.) প্রথমে একথা কেন বোলবেন যে, ওরাতো আমার লোক, অর্থাৎ আমার উম্মত। ঐ লোকগুলি আজকের "উম্মতে মোহাম্মদী"। দৃশ্যতঃ এত উৎকৃষ্ট উম্মতে মোহাম্মদী যে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল পর্যন্ত প্রায় ধোঁকায় পতিত হবেন। আল্লাহ বাধা না দিলে তো কাওসারেi cwb পান করিয়েই দিতেন। কাপড়ে চোপড়ে, চলাফেরায়, কথাবার্তায়, খাওয়া দাওয়ায়, শোয়ায় তারা উৎকৃষ্ট সুন্নাহ পালনকারী কিন্তু আসলে বেদা'ত ও শেরকে নিমজ্জিত। যাত্রাদলের কাঠের বন্দুক দেখতে একদম বন্দুক, কিন্তু তা থেকে গুলি বের হয় না। এরা নিজেদের ফাঁকি দিচ্ছেন, অন্যকে ফাঁকি দিচ্ছেন এবং কেয়ামতে আর একটু হলেই একেবারে স্বয়ং নবী করীম (দ.) কেই ফাঁকি দিয়ে ফেলেছিলেন আর কি! এই উম্মাহর একমাত্র শাফায়াতকারী তিনি। তিনি যদি আমাদেরকে তাঁর উম্মাহ বলে স্বীকার না করেন, দূর হও! দূর হও! বলে তাড়িয়ে দেন, তবে জাহান্নাম ছাড়া আমাদের আর কোন জায়গা নেই।

চে'র মতো সেজেছেন তার এক ভক্ত। একইভাবে আল্লাহর রসুলের বাহ্যিক অনুকরণ করেই উম্মতে মোহাম্মদী বনে যেতে চান অনেকে।